ইতিহাস

ইতিহাস

কোচবিহার জেলার পুরাকীর্তি

তথ্য-সংকলন ও গ্রন্থনা

ডঃ শ্যামচাঁদ মুখোপাধ্যায়, এম. এ.; ডি. ফিল্.

অধীক্ষক, পুরাতত্ত্ব অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সম্পাদনা

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আই. এ. এস. (অবসরপ্রাপ্ত)

বিশেষ আধিকারিক, পূর্ত (পুরাতত্ত্ব) বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ও

অধ্যাপক সুধীররঞ্জন দাশ, এম এ.; পি. এইচ. ডি ; এফ. এ. এস.

অধ্যক্ষ, পুরাতত্ত্ব বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

পূর্ত (পুরাতত্ত্ব) বিভাগ ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রকাশনা এবং ©:
পূর্ত (পুরাতত্ত্ব) বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মুদ্রণ ও ব্লক :
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড

প্রচ্ছদপটশিল্পী :
শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

মানচিত্র :
শ্রীনেপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

মুদ্রাকর :
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড
৩২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৭০০০০৯

দ্বিতীয় মুদ্রণ :
১,১০০ কপি

প্রথম প্রকাশ :
আশ্বিন, ১৩৮১
(অক্টোবর, ১৯৭৪)

মূল্য ৪·০০ টাকা

মুখবন্ধ

কিছুকাল আগে পূর্ত (পুরাতত্ত্ব) বিভাগ পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলা এবং কলিকাতার পুরাকীর্তি ও পুরাবস্তুগুলির বিশদ বিবরণ-সংবলিত এক গ্রন্থমালা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন। বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলা-সম্পর্কিত পুস্তক দু'টি প্রকাশের পর, বর্তমান গ্রন্থটি সেই প্রকল্পের তৃতীয় পুস্তক। নাগরিকদের শুধু শারীরিকই নয়, মানসিক উন্নতিও এখন যে-কোন জনকল্যাণকামী, প্রগতিশীল রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্য। সেজন্য সমস্ত সভ্য দেশের সরকারই জনসাধারণের সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশ গ্রহণ ক'রে থাকেন। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার সিনেমা, টেলিভিশন প্রভৃতির উন্নতি-প্রচেষ্টার সঙ্গে বর্তমান গ্রন্থমালা প্রকাশনের দায়িত্বকে অতএব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব'লে মনে করেন।

এই 'সিরিজ'-এর প্রথম পুস্তক, শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত 'বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি' গ্রন্থটির মুখবন্ধে তৎকালীন প্রকাশন কমিটির সভাপতি, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় লিখেছিলেন, এই গ্রন্থমালা "সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের পুরাকীর্তিবিষয়ক এক আকর-গ্রন্থের (• Archaeological Encyclopaedia of West Bengal) অভাব পূরণ করিবে।…যোগ্যতার সহিত এ কাজটি সম্পন্ন করিতে পারিলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের দাবী করিতে পারিবেন।"

পুরাতত্ত্বের ছাত্র হিসাবে আমার এবিষয়ে আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। সেজন্য ডক্টর সুধীররঞ্জন দাশ (অধ্যক্ষ, পুরাতত্ত্ব বিভাগ ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) ও অবসরপ্রাপ্ত আই. এ. এস. শ্রীযুত অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ('বাঁকুড়ার মন্দির' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা), এই দু'জন বিশেষজ্ঞকে নিয়ে আমার সভাপতিত্বে একটি প্রকাশন কমিটি গঠিত হয়েছে। ডক্টর দাশ ও শ্রীযুত বন্দ্যোপাধ্যায় নিজ নিজ অধ্যয়নের ক্ষেত্রে কৃতবিদ্য ও প্রথিতযশা। পূর্ত (পুরাতত্ত্ব) বিভাগ থেকে অতঃপর কোন পুস্তকই তাঁদের সযত্ন সম্পাদনা ছাড়া প্রকাশিত হবে না। তাতে গ্রন্থগুলির উৎকর্ষই শুধু বৃদ্ধি পাবে না, এ বাবদ সরকারী ব্যয়েরও সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার হবে।

'পুরাকীর্তি সিরিজ'-এর গ্রন্থমালা সাধারণ পাঠকের জন্যই লিখিত হচ্ছে। সেজন্য এগুলির দাম যতদূর সম্ভব কম রাখা হবে।

আর কয়েকটি জেলার অনুরূপ পুস্তকের কাজ ইতিমধ্যেই হাতে নেওয়া হয়েছে এবং, কোন অলঙ্ঘনীয় ব্যাঘাত না ঘটলে, সমস্ত প্রকল্পটি আনুমানিক দু'বছরের মধ্যে শেষ হবে, আশা করা যায়। আমাদের এই সাংস্কৃতিক প্রয়াস জনগণের অকুণ্ঠ সহযোগিতা লাভ করবে ব'লে ভরসা রাখি।

সুব্রত মুখোপাধ্যায়
ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী, পূর্ত (পুরাতত্ত্ব) বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পশ্চিমবঙ্গ মহাকরণ
২ আশ্বিন ১৩৮১

গ্রন্থকারের নিবেদন

পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় উত্তরাঞ্চলের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার এই তিনটি জেলার পুরাকীর্তির সংখ্যা খুবই অল্প। আর কোচবিহার ছাড়া অন্য জেলাগুলির কোন উল্লেখযোগ্য ইতিহাসও নেই। কোচরাজ্য ও কোচজাতির আদিম ইতিহাস এখনও অজ্ঞাত। এখানকার প্রামাণ্য ইতিহাসের শুরু খ্রীষ্টীয় পনেরো শতকের শেষ ভাগ থেকে। মধ্যযুগের কিছু সংস্কৃত, ফার্সী ও প্রাচীন বাংলা পুস্তকে এই জাতি বা রাজ্যের উল্লেখ আছে। আগে এই রাজ্য বা দেশ কামরূপ ও কামতা নামে পরিচিত ছিল। পাল-সেন যুগের কয়েকটি পাথরের মূর্তি ছাড়া এখানে পুরাবস্তুও এমন কিছু আবিষ্কৃত হয় নি। কোচবিহারের যাবতীয় পুরাকীর্তি এ পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে, এমন অসম্ভব দাবী কখনই করা যায় না, তবে উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তিগুলির এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া হয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস।

অসংখ্য কাজের মধ্যেও এই পুস্তকের মুখবন্ধ সানন্দে লিখে দিতে রাজী হওয়ায় আমি ব্যক্তিগতভাবে তথ্য ও জনসংযোগ, পৌর ও পঞ্চায়েত, যুবকল্যাণ এবং পূর্ত (পুরাতত্ত্ব) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী শ্রীযুক্ত সুব্রত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে অশেষ ঋণী।

পূর্ত (পুরাতত্ত্ব) বিভাগের বিশেষ আধিকারিক শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আই.এ.এস. (অবসরপ্রাপ্ত) ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ সুধীররঞ্জন দাশ, এম.এ., পি.এইচ.ডি., এফ.এ.এস. মহাশয়েরা বর্তমান পুস্তকটির সম্পাদনা ও প্রকাশনা ব্যাপারে যারপরনাই সচেষ্ট হওয়ায় আমি তাঁদের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। পুরাতত্ত্ব

অধিকর্তা শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, এম.এ., মহাশয় এই পুস্তক রচনার ব্যাপারে আমাকে অনুপ্রাণিত করায় আমি কৃতজ্ঞ। পুরাতত্ত্ব অধিকারের আলোকচিত্রশিল্পী শ্রীরণজিৎকুমার সেন কর্তৃক গৃহীত আলোকচিত্রগুলি ও শ্রীনেপালচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রস্তুত মানচিত্রটি এ পুস্তকের শ্রীবৃদ্ধি করবে বলেই আমার বিশ্বাস। এঁদের আমি ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে পুস্তকটির সুষ্ঠু প্রকাশনের জন্য শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেডের শ্রীদীপক ঘোষকে আমি অভিনন্দন জানাই।

পুরাতত্ত্ব অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ — শ্যামচাঁদ মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত (পুরাতত্ত্ব) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী শ্রীযুত সুব্রত মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর বিভাগ বা অধীনস্থ পুরাতত্ত্ব অধিকার থেকে ভবিষ্যতে প্রকাশিত যাবতীয় পুস্তক-পুস্তিকার সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত করে আমাদের উপর যে গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন সেজন্য প্রথমেই তাঁকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এবিষয়ে নীতি নির্ধারণের জন্য সম্প্রতি যে প্রকাশন কমিটি গঠিত হয়েছে, শ্রীযুত মুখোপাধ্যায় স্বয়ং তার সভাপতি ও আমরা তার সভ্য। এই কমিটির নীতিগত ও অন্যান্য নির্দেশ অনুসারে আমাদের কর্তব্যপালনে আমরা প্রতিশ্রুত।

পূর্বতন প্রকাশন কমিটি বর্তমান পুস্তকের পাণ্ডুলিপিটি প্রথমে স্বর্গত অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু ও পরে অধ্যাপক সরসীকুমার সরস্বতীর কাছে তাঁদের মতামতের জন্য পাঠিয়েছিলেন। তাঁদের বিস্তৃত মন্তব্যের ভিত্তিতে পাণ্ডুলিপিটির আদ্যন্ত সম্পাদনা ছাড়াও বর্ণিত স্থানগুলিতে পৌঁছাবার পথনির্দেশ এবং পুরাকীর্তিগুলির সঠিক মাপজোখ সংযোজন করবার প্রয়োজন হয়। সে কাজ কতদূর পারদর্শিতার সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে তার বিচারের ভার পাঠক-সাধারণের হাতে ছেড়ে দেওয়াই সমীচীন। তবে একথার উল্লেখ হয়ত প্রয়োজন যে, আমাদের যৌথ সিদ্ধান্ত অনুসারে, বর্তমান গ্রন্থের সম্পাদনা, 'প্রুফ' দেখা, ছবিগুলির 'লে-আউট' প্রস্তুত করা ও ছাপাখানার সঙ্গে যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয়ে

সর্বদা সংযোগ রক্ষার দায়িত্ব প্রধানত শ্রীযুত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কেই বহন করতে হয়েছে। এ পুস্তকের মূল পাণ্ডুলিপির গ্রন্থকার 'অনুক্রমণিকা'টি তৈরি করে দিয়ে এবং নানান অসুবিধার মধ্যেও শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেডের কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতার জন্য তাঁরা আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন।

বর্তমান 'সিরিজ'-এর পরবর্তী গ্রন্থগুলির দ্রুত প্রকাশনের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। আশা করা যায়, এই গুরুভার কাজটি আগামী দু'বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ করা যাবে।

পশ্চিমবঙ্গ মহাকরণ — অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
২ আশ্বিন ১৩৮১ — সুধীররঞ্জন দাশ

সূচীপত্র

ভূমিকা

ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক রূপরেখা : কোচবিহার জেলা (পূর্বেকার কোচবিহার করদ মিত্ররাজ্য) বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। এই জেলার উত্তরে জলপাইগুড়ি জেলা, পূর্বে আসাম ও বাংলাদেশ, দক্ষিণে বাংলাদেশ ও জলপাইগুড়ি জেলা এবং পশ্চিমে জলপাইগুড়ি জেলা। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের এই জেলাটি ২৫°৫৮' থেকে ২৬°৩৩' উত্তর অক্ষাংশে ও ৮৮°৪৮' থেকে ৮৯°৫৫' পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। অনেকটা ত্রিভুজের আকৃতিবিশিষ্ট এ জেলার আয়তন ৩,২৩৮ বর্গ কিলোমিটার।

এখানকার ভূভাগ পলিমাটি ও বালির মিশ্রণে গঠিত। সবচেয়ে উপরের মাটি অনেকটা দোআঁশলা ধরনের ও ছাই রঙের। সেজন্য এখানকার মাটির উর্বরাশক্তি অধিক এবং জমি সুফলা। কৃষিজাত ফসলের মধ্যে ধান, পাট ও তামাকই প্রধান। এখানকার অধিবাসীদের অধিকাংশই কৃষিনির্ভর।

কোচবিহার জেলায় জলাভূমি ও নদীর সংখ্যা প্রচুর। নদীগুলির মধ্যে তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা, কালজানি, রায়ডাক, ধরলা ও গদাধরই প্রধান। সেগুলি সাধারণত উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত। নদীগুলির উৎপত্তিস্থল হিমালয়ের নিম্নভাগে বা আরও উপরে হওয়ায় বর্ষার সময় প্রায় সমস্ত নদীতেই বন্যা দেখা দেয়। বাংলাদেশের অনেক জেলার ন্যায় প্রাক্‌-স্বাধীনতা যুগে এখানেও নদীপথে যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্য হ'ত।

১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার অনুযায়ী এ জেলার লোকসংখ্যা ১৪,১৪,১৮৩ ও প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনবসতি ৪১৮। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা নিম্নরূপ—

হিন্দু-১১,১১,০১৭ ; মুসলমান-৩,০০,৪৯৬ ; তপশীলী সম্প্রদায় (castes)-৬,৬৫,০২০ ; তপশীলী উপজাতি (tribes)-১০,৬১১ ; জৈন-১,৫২৪ এবং খ্রীষ্টান-১,০৭৬।

এই জেলায় প্রচলিত মোট ৪৮টি ভাষা ও উপভাষার মধ্যে বাংলাই প্রধান ; অন্য ভাষাগুলির ভিতর হিন্দী, অসমীয়া, লুসাই, খেড়িয়া, গারো, রাভা, কাছাড়ী, খাসিয়া, মুণ্ডারি ও সাঁওতালী উল্লেখযোগ্য।

সাম্প্রতিক আদমশুমার থেকে কোচ ও মেচ ভাষাভাষীদের প্রকৃত সংখ্যা সঠিকভাবে জানা যায় না, কেন না তাঁদের পৃথকভাবে না দেখিয়ে রাজবংশী হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের লোকগণনায় কোচ, মেচ ও রাভাদের সংখ্যা ছিল প্রায় চার লক্ষের মত।

প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ হজসনের মতে কোচরা বোড়ো ও ধীমল গোষ্ঠীর সমপর্যায়ভুক্ত। বুকানন হ্যামিলটনের মতও অনুরূপ। নৃতত্ত্ববিদ ড্যালটনের মতে কোচরা দ্রাবিড়-ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। রিজলির ধারণা কোচদের দেহে মোঙ্গোলীয় রক্ত থাকলেও দ্রাবিড়দের সঙ্গে তাঁদের সাদৃশ্য বেশী। ঐতিহাসিক গ্যেট বলেছেন, কোচদের সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ থাকার কারণ, কোচরা সাধারণভাবে রাজবংশী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত এবং রাজবংশীদের সম্বন্ধে সমাজবিজ্ঞানী ও ভাষা-তত্ত্ববিদদের মতপার্থক্য। কারও কারও মতে কোচরাজাদের রাজত্ব-কালে কোচ ও রাজবংশীদের মধ্যে অবাধ মেলামেশার ফলে কোচরা তাঁদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংস্কৃতিগতভাবে উন্নত রাজবংশীদের প্রভাবে প'ড়ে রাজবংশী সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে পড়েন। আসামের গোয়ালপাড়া ছাড়া অন্যত্র কোচরা এখন স্থানীয় হিন্দুসমাজের অঙ্গীভূত হয়ে গেছেন। উত্তরবঙ্গে ও আসামের গোয়ালপাড়া অঞ্চলে কোচদের অন্ত্যজ বলে গণ্য করা হত। তাই তাঁরা সামাজিক সুবিধা ও আত্মরক্ষার জন্য রাজবংশীদের সঙ্গে মিশে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। গ্যেটের নিজস্ব মত এই যে কোচরা মোঙ্গোলীয় ও রক্তের দিক থেকে তাঁদের সঙ্গে মেচ ও গারোদের যথেষ্ট মিল আছে। রাজবংশীয়দের গায়ের বর্ণ তামাটে ও কালো হলেও, মুখ কিছুটা মোঙ্গোলীয় ধরনের। কোচ-ভাষা এখন অপ্রচলিত হলেও পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে ও আসামের গোয়ালপাড়ায় শতাব্দীকাল আগেও এ ভাষার প্রচলন ছিল। কোচবিহার রাজ্যের পুরানো সনদ, দলিল, পুঁথি প্রভৃতি থেকে কোচভাষা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়। এই ভাষার সঙ্গে গারো ভাষার অনেক সাদৃশ্য আছে।

হজসন, হ্যামিলটন, গ্যেট ও অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে কোচভাষা বোড়ো নামক একটি উপ-ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায় অবশ্য মনে করেন, এই ভাষা মোঙ্গোলীয়প্রভাবিত তিব্বতী-ব্রহ্মদেশীয় ভাষাগোষ্ঠীর বোড়ো নামক উপগোষ্ঠীর অন্তর্গত। তিনি ও আরও কিছু ভাষাবিজ্ঞানী বোড়ো উপগোষ্ঠীর ভাষাগুলিকে পূর্ব

ও পশ্চিম শাখায় ভাগ করেছেন যার মধ্যে কোচ ও হাজো ভাষা পশ্চিম শাখার অন্তর্গত। এই উপ-ভাষাগোষ্ঠীর লোকেরা কিরূপে নিজেদের সম্প্রসারণ করলেন সে সম্বন্ধে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় বলেন—প্রায় এক হাজার বছর আগে এই উপগোষ্ঠীর লোকেরা প্রথমে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বসতি স্থাপন করেন ও পরে তাঁদের উত্তরবঙ্গে, এমন কি উত্তরবিহারেও, ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। উত্তরবঙ্গ ও আসামে বহুকাল বসবাস করার পর তাঁরা হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হন ও তাঁদের বড় একটি অংশ মূল গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হিন্দুসমাজের অন্তর্বর্তী হয়ে পড়েন। অবশিষ্টেরা তাঁদের অনুগমন করেন।

গত এক হাজার বছরে কোচবিহারের ভৌগোলিক সীমা ও পরিচয় একইরূপ থাকে নি; কেন না, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই দেশ বা রাজ্য তৎকালে প্রসিদ্ধ প্রাগ্‌জ্যোতিষ, লৌহিত্য, কামরূপ, কামতা ও কোচবিহার দেশ বা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পুরাণ ও তন্ত্রে প্রাচীন কামরূপের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা থেকে জানা যায়, এই দেশ কামপীঠ, রত্নপীঠ, সুবর্ণপীঠ ও সৌমারপীঠ নামে চারটি পীঠে বিভক্ত ছিল। প্রাচীন কোচবিহার রাজ্য ছিল সৌমারপীঠের অন্তর্গত। কামরূপকে মুসলমান ঐতিহাসিকরা কখনও কামরূপ, কখনও বা কামরু ব'লে উল্লেখ করেছেন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে আবার তৎকালে প্রসিদ্ধ কামতা রাজ্যকে কামরূপ থেকে পৃথক ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে (সুলতান হোসেন শাহের শিলালিপি ও মুদ্রা থেকে কামরু ও কামতা যে দুটি পৃথক রাজ্য ছিল তা বেশ বোঝা যায়)। কামতা রাজ্যকে আবার কোনও কোনও মুসলমানী মুদ্রায় চাউলিস্তান বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। এসব তথ্য থেকে সিদ্ধান্ত করা চলে যে, খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের কোন সময়ে কামরূপের পশ্চিম ভাগে কামতা নামে একটি স্বাধীন রাজ্যের পত্তন হয়েছিল যেখানে খেনবংশের রাজারা রাজত্ব করতেন। এই বংশের মোট তিনজন রাজার নাম আমরা জানতে পেরেছি, যথা নীলধ্বজ, চক্রধ্বজ ও নীলাম্বর। এঁদের পরস্পরের মধ্যে কি সম্পর্ক ছিল, তা জানা যায় না। তবে 'বংশাবলী' ও 'বুরুঞ্জী' গ্রন্থ থেকে দেখা যায় রাজা নীলধ্বজ এই রাজবংশ তথা কামতা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন, চক্রধ্বজ সম্ভবত তাঁর পুত্র ও নীলাম্বর সম্ভবত তাঁর পৌত্র ছিলেন। এঁদের সম্বন্ধে নানা অলৌকিক কাহিনী ও কিংবদন্তী 'বুরুঞ্জী' গ্রন্থগুলিতে স্থান পেয়েছে। খেনবংশের শেষ

রাজা নীলাম্বরের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে কোনও সংশয় নেই, কেন না তাঁর রাজত্বকালেই (খ্রীঃ ১৪৭৩-১৪৯৮/৯৯) সুলতান হোসেন শাহ কামতা রাজ্য ধ্বংস করেন। কেউ কেউ নীলধ্বজ ও নীলাম্বরকে কোচ বা কোচবংশজাত বলে মনে করেন। আনুমানিক ১৫১০' বা ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান কোচরাজবংশের আদিপুরুষ বিশু বা বিশ্বসিংহ এক স্বাধীন কোচরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এর সর্বশেষ রাজধানী ছিল বর্তমান কোচবিহার শহরের কাছেই। পূর্বতন রাজধানী ছিল চিকনা, হিঙ্গুলাবাস প্রভৃতি স্থানে। বিশ্বসিংহ ও তাঁর দ্বিতীয় পুত্র রাজা নরনারায়ণের সময়ে কোচরাজ্য কামতা নামেই প্রসিদ্ধ ছিল ও তার আয়তন ব্রিটিশ আমলের কোচবিহার সামন্তরাজ্যের থেকে অনেক বড় ছিল। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের কিছু সংস্কৃত পুঁথিতে কামতা রাজ্য ও কামতা নগরীর উল্লেখ আছে। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে রচিত 'ব্লেভের মানচিত্র'-তেও এ রাজ্য ও নগরীর উল্লেখ আছে।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে লিখিত ইংরেজ ভ্রমণকারী রাল্‌ফ ফিচ্-এর বর্ণনা থেকে কোচরাজ্য সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে মুঘল রাজশক্তি এই রাজ্যের কিছু অংশ জয় করে নেন ও ঐ অংশের নাম দেওয়া হয় সরকার কোচবিহার। সরকার কোচবিহার দুটি বিভাগে, দুটি চাকলায় ও উননব্বইটি পরগণায় বিভক্ত ছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের 'বাদশাহনামা' 'শাহজাহাঁনামা', 'তারিখ-ই-আসাম' ও 'আলমগীরনামা' প্রভৃতি ফার্সী গ্রন্থে কোচদেশের পশ্চিমভাগকে কামতা না ব'লে কোচবিহার বলা হয়েছে। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকে রচিত ভ্যান্ ড্যান্-ব্রুকের মানচিত্রে ও একজন অজ্ঞাতনামা ওলন্দাজ নাবিকের বিবরণীতে কোসবিয়া (Kosbia) নামের উল্লেখ আছে। কিন্তু এ নাম কোন দেশ কিংবা শহরের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়েছিল কিনা তা জানা যায় না। ওই সময়ে লেখা অনেক সংস্কৃত পুঁথিতে কোচবিহারকে কামতাবিহার বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। এমন কি, 'আইন-ই-আকবরী' ও 'বাহরিস্তান-ই-ঘায়েবী' নামে দুটি ফার্সী গ্রন্থে কামতা ও কামরূপ রাজ্য দুটিকে কোচদেশের অন্তর্ভুক্ত বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে নরনারায়ণের রাজত্বকালে কোচদেশের কোচ হাজো বা কামরূপ ও কোচবিহার এই দুই ভাগে বিভক্ত হওয়ার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। অতএব

দেখা যায়, খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতক পর্যন্ত কোচরাজ্য কামতা নামে পরিচিত ছিল এবং ওই শতকেই কামতা নামের বদলে কোচবিহার নামও প্রচলিত হয়। কোচ রাজবংশের বিশ্বসিংহ, নরনারায়ণ, প্রাণনারায়ণ প্রভৃতি রাজাদের অন্যতম উপাধি ছিল কামতেশ্বর। কোচবিহার রাজ্যকে কখনও কখনও বিহার বা বেহার বা নিজবেহার বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। কোচবিহার রাজসরকারের অনেক সনদ, চিঠিপত্র, শিলালিপি ও পুঁথিতে এবং রেণেলের মানচিত্রে বিহার রাজ্য ও নগরীর উল্লেখ আছে। 'বিশ্বকোষ'-এর লেখকের মতে কোচবিহার রাজ্যের নাম আদিতে বিহার ছিল, পরে কোচরাজা লক্ষ্মীনারায়ণের সময় থেকে মুঘলশাসিত বিখ্যাত বিহার সুবা বা প্রদেশের সঙ্গে এই রাজ্যের নামের ভ্রান্তির আশঙ্কায় ও পার্থক্য বোঝাবার জন্য কোচবিহার নামকরণ হয়। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের অনেক রাজসনদে ও দলিলে রাজ্যটিকে 'নিজবিহার' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই নামবিভ্রাট দূর করবার জন্য ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কোচবিহার রাজসরকার এক বিজ্ঞপ্তিতে সব ক্ষেত্রেই রাজ্যের নাম কোচবিহার হবে ব'লে নির্দিষ্ট করে দেন।

এ রাজ্যের নাম কোচবিহার হবার নানা কারণ আছে। আমানতউল্লা তাঁর 'কোচবিহারের ইতিহাস' গ্রন্থে এসম্বন্ধে বলেছেন—(১) 'কোচ'দের 'বিহার'ক্ষেত্র বা বাসস্থান থেকে কোচবিহার নামের উৎপত্তি; (২) কোচবধূপুর (শিবজায়া পার্বতী নাকি কোচ জাতীয়া ছিলেন বা স্বয়ং শিব কোচ জাতীয় ছিলেন বলে তাঁর জায়া কোচবধূ) থেকে কোচবিহার নাম; (৩) 'কোচ'দেশ ও তার রাজধানী বা প্রধান নগরী 'বিহার' থেকে কোচবিহার নাম; (৪) মুঘল সুবা 'বিহার' থেকে কোচ রাজ্য বা দেশ 'বিহার'-এর পার্থক্য বোঝাবার জন্য 'কোচবিহার' নাম।

কোচ নামের উৎপত্তির পিছনেও অনেক কিংবদন্তী আছে, যাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য:

(১) ক্রোড় থেকে কোচ—পরশুরামের ভয়ে যেসব ক্ষত্রিয় ভগবতীর ক্রোড়ে বা কোচে আশ্রয় নেন তাঁরা পরে কোচ নামে খ্যাত হন;

(২) সঙ্কোচ থেকে কোচ—পরশুরামের ভয়ে ভীত হয়ে ক্ষত্রিয়কুল সঙ্কুচিত হয়ে যাবার ফলে সঙ্কোচ বা কোচ আখ্যা পান;

(৩) সঙ্কোষ থেকে কোচ—সঙ্কোষ নদের তীরবর্তী হওয়ায় এই দেশের নাম হয় কোষ বা কোচ ;

(৪) কুবচ বা কুবাচক থেকে কোচ—'যোগিনী তন্ত্র' ও 'জাতি কৌমুদী'তে "কুবচ"দের ও 'পদ্মপুরাণ'-এ "কুবাচক"দের কথা বলা হয়েছে। "কুবচ" বা "কুবাচক" শব্দ দুটির মানে একই, অর্থাৎ মন্দ বা খারাপ ভাষাভাষী। "কুবচ" অর্থে মন্দ বা খারাপ ভাষাও হয়। 'পদ্মপুরাণ'-এর একটি শ্লোক থেকে জানা যায় যে ঐ "কুবাচক"রা ম্লেচ্ছ বা নীচ জাতীয় ছিল, পাহাড়ে (গিরি-উপত্যকায়) বসবাস করত আর মন্দ বা পিশাচ বা অনার্য ভাষায় কথা বলত। "কুবচ" বা "কুবাচক" শব্দ থেকে কোচ শব্দটি উৎপত্তি হয়ে থাকতে পারে আর তা যদি হয়ে থাকে তা হলে এটা স্বীকার করে নিতে হবে যে আদিতে কোচেরা আর্য হিন্দুদের দুর্বোধ্য এক ভাষায় (পিশাচ = তিব্বতী-ব্রহ্মদেশীয় বোড়ো উপগোষ্ঠীর কোচভাষায়) কথা বলত ও ভুটান বা আসামের কোনো পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস করত। জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই মতের সমর্থক ;

(৫) কমোচ বা কবোঁচ থেকে কোচ বা কোঁচ—অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের মতে কোচ বা কোঁচ শব্দের সংস্কৃত রূপ হবে কম্বোজ। এই কম্বোজ দেশটি সকলের কাছে পরিচিত বিখ্যাত কম্বোজ দেশ থেকে পৃথক ও উত্তর-পূর্ব ভারতের কোনও অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতকের শিলাফলকে ও তাম্রপট্টে কম্বোজ বা কম্বোজ-বংশীয় কয়েকজন রাজার নামের উল্লেখ আছে যাঁদের মধ্যে অনেকের উপাধি ছিল পাল ;

(৬) 'কোচক' থেকে কোচ—ধ্রুবানন্দ মিশ্রের 'কুলকারিকা'য় কোচক দেশের অধিবাসীদের কোচ বলা হয়েছে।

ডঃ বি. কে. কাকতির মতে কামরূপ, কামাখ্যা, কামতা প্রভৃতি 'কাম' 'উপসর্গ'যুক্ত শব্দগুলি অস্ট্রিক ভাষার অন্তর্গত।

অনেক সংস্কৃত, ফার্সী, বাংলা ও অসমীয়া ভাষায় লেখা গ্রন্থে, বিশেষত 'বংশাবলী' ও 'বুরুঞ্জী'জাতীয় গ্রন্থে কোচদের দেশ, জাতি ও রাজাদের সম্বন্ধে বহু কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। 'তারিখ-ই ফেরেস্তা'য় শঙ্কল বা শাঙ্কলদীপ বা সাঙ্গলদেব নামে একজন কোচ রাজার উল্লেখ আছে। এঁর রাজত্বকাল সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না, তবে মনে হয় ইনি খ্রীষ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতকে রাজত্ব করতেন। কোচবংশীয়

অন্যান্য (প্রাচীন) রাজাদের মধ্যে দুর্লভনারায়ণ, কামেশ্বর, কান্তেশ্বর প্রভৃতির নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা সম্ভবত খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে বিদ্যমান ছিলেন। প্রাচীন 'বংশাবলী' বা 'বুরুঞ্জী'-জাতীয় গ্রন্থে এসব রাজাদের নাম পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে বারোজন জমিদার খুব প্রতাপশালী হয়ে ওঠেন ও 'বারোভূঁইয়া' নামে খ্যাত হন। তাঁদের মধ্যে হাজো নামে একজন কোচবংশীয় ভূঁইয়াও ছিলেন। এঁর নামে কামরূপের একাংশের নামকরণ হয় কোচ হাজো। বর্তমান কোচবিহার রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বসিংহের পিতা হরিদাস বা হারিয়া কোচ নায়কদের মণ্ডল বা প্রধান ছিলেন। বিশ্বসিংহ হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি বিস্তারের কাজে বিশেষ মনোযোগ দেন। এঁর সময়ে কোচরাজ্য পশ্চিমে করতোয়া থেকে পূর্বে গৌহাটী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আনুমানিক ১৫৪০ বা ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। বিশ্বসিংহ তাঁর দ্বিতীয় পুত্র নরনারায়ণকে পরবর্তী রাজারূপে মনোনীত করেন। বিশ্বসিংহের মৃত্যুর সময়ে যুবরাজ নরনারায়ণ রাজধানীতে অনুপস্থিত ছিলেন। এই সুযোগে তাঁর বড় ভাই নরসিংহ নিজেকে রাজা ব'লে ঘোষণা করেন। কিন্তু নরনারায়ণ এই ব্যবস্থা মেনে নিতে না পেরে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করেন ও দেশত্যাগে বাধ্য করেন। নরনারায়ণের আর এক নাম ছিল মল্লদেব। ইনি এঁর এক ভাই চিলারায় বা শুক্লধ্বজের সাহায্যে কোচরাজ্যকে শীঘ্রই এক বিস্তৃত রাজ্যে পরিণত করেন। জয়ন্তিয়া প্রভৃতি নানা রাজ্য জয় করে নরনারায়ণের অহোম বা আসাম রাজ্য জয়ের বাসনা হয়। এই যুদ্ধে শুক্লধ্বজ অসমসাহসিকতার পরিচয় দিলেও অহোমরাজকে পরাজিত করতে পারেন নি। চিলের মত অতর্কিত আক্রমণে বা গেরিলাযুদ্ধে শুক্লধ্বজ শত্রুদের নাস্তানাবুদ করতেন ব'লে তিনি চিলারায় নামে খ্যাত হন। নরনারায়ণ যে সমস্ত রাজ্য জয় করেন বা যে সমস্ত রাজ্যকে কর দিতে বাধ্য করেন তাদের মধ্যে জয়ন্তিয়া, ডিমরুয়া, মণিপুর, ত্রিপুরা ও কাছাড় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কোচরাজের এই সাফল্যে তৎকালীন গৌড়ের সুলতানও শঙ্কিত হয়েছিলেন। নরনারায়ণও গৌড়ের প্রতিপত্তি ভাল চোখে দেখতেন না। কোনও কারণে এক সময়ে কোচবিহাররাজের সঙ্গে গৌড়ের সুলতানের এক যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে কোচবিহারের পরাজয় হয় ও শুক্লধ্বজ শত্রুদের হাতে বন্দী হন। পরে গৌড়ের সুলতানের সঙ্গে কোচবিহারের রাজার এক সন্ধি হয় ও

শুক্লধ্বজ মুক্তি পান। নারনারায়ণের রাজত্বের শেষ দিকে বঙ্গদেশে মুঘলরাজশক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। দূরদর্শী কোচ রাজা প্রবলতর রাজশক্তির সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে তাঁর শিশু রাষ্ট্রকে বাঁচাবার মানসে মুঘল বাদশাহের সঙ্গে আগেভাগেই এক সন্ধি করে ফেলেন। কিন্তু এত করেও কোচবিহার রাজ্যের অখণ্ডতা বজায় রাখা গেল না। অপুত্রক নরনারায়ণ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুদেবকে (শুক্লধ্বজপুত্র) উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন, কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে তাঁর এক পুত্র হওয়ায় ওই ভ্রাতুষ্পুত্র রাজ্যলাভ অসম্ভব দেখে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। এর ফলে রাজ্যে এক দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। রাজা এই গৃহবিবাদে শঙ্কিত হয়ে তাঁর রাজ্যকে পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রদের মধ্যে ভাগ করে দিতে বাধ্য হন। সঙ্কোষ নদ এই দুই রাজ্যের সীমানাচিহ্নরূপে নির্ধারিত হয়; তার পশ্চিমভাগের নাম হল কোচবিহার ও পূর্বভাগের নাম হল কামরূপ। পরবর্তিকালে এই প্রতিবেশী দুই রাজ্যের মধ্যে অবিরত সংঘর্ষ চলতে লাগল যার ফলে দুই রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ল। ক্রমবর্ধমান মুঘলরাজশক্তি এই গৃহবিবাদের পূর্ণ সুযোগ নিয়ে রাজ্য দুটিকে গ্রাস করবার নানা চেষ্টা করতে লাগলেন।

১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে নরনারায়ণ মারা গেলেন তাঁর অল্পবয়স্ক পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ কোচবিহারের রাজা হন। জ্ঞাতিশত্রু রঘুদেবের সঙ্গে তাঁর প্রায়ই মনান্তর হতে লাগল এবং একে অপরকে জব্দ করার নানা উপায় খুঁজতে লাগলেন। এক সময়ে লক্ষ্মীনারায়ণ পরীক্ষিৎনারায়ণকে তাঁর পিতা রঘুদেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার জন্য নানা প্ররোচনা দেন ও সফলও হন; কিন্তু রঘুদেব সে বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হন। তারপর রঘুদেব লক্ষ্মীনারায়ণের রাজ্য আক্রমণের উদ্যোগ করতে লাগলেন। এদিকে লক্ষ্মীনারায়ণ রঘুদেবের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে মুঘলরাজশক্তির সঙ্গে এক মৈত্রীচুক্তি করলেন। কিন্তু রঘুদেব এতে বিচলিত না হয়ে ঈশা খাঁর সহায়তায় কোচবিহারের বাহিরবন্দ পরগণা দখল করে নিলেন। এই সময়ে লক্ষ্মীনারায়ণের অনুরোধে মুঘল-সেনাপতি রাজা মানসিংহ রঘুদেবের রাজ্য আক্রমণ করে বাহিরবন্দ পুনর্দখল করলেন ও কামরূপকে মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করলেন। কিন্তু পরীক্ষিৎনারায়ণ কামরূপের রাজা হয়ে বাহিরবন্দ পরগণা আবার দখল করে নিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ তখন পুনরায় মুঘলরাজশক্তির শরণ নিলেন ও মুঘলের সহায়তায় বাহিরবন্দ আবার

ফিরে পেলেন। এই যুদ্ধেও কামরূপরাজের হার হল ও কামরূপ মুঘলের পদানত হল। এদিকে লক্ষ্মীনারায়ণেরও মর্যাদাহানি হল এবং তিনি মুঘলের অধীনে সামন্ত রাজায় পরিণত হলেন। মুঘলের প্রয়োজনে লক্ষ্মীনারায়ণকে সৈন্যাদি সরবরাহ করতে হত। এক সময়ে লক্ষ্মীনারায়ণ মুঘলের বিরাগভাজন হয়ে বন্দী হন ও প্রায় এক বছর পরে ছাড়া পেয়ে নিজের রাজ্যে ফিরে যান। এর কিছুদিন পরে তিনি মুঘলের হয়ে কামরূপে যুদ্ধ করতে যান ও সেখানে প্রায় দশ বছর থাকার পর পরলোকগমন করেন। লক্ষ্মীনারায়ণ যে সময়ে রাজ্যে অনুপস্থিত ছিলেন সে সময়ে তাঁর পুত্র বীরনারায়ণ তাঁর প্রতিভূরূপে রাজত্ব করতেন। ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে, লক্ষ্মীনারায়ণের মৃত্যুর পর বীরনারায়ণ রাজা হলেন ও প্রায় সতেরো বছর রাজত্ব করেন। ইনি মুঘলদরবারে নিয়মিত কর পাঠাতেন। ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বীরনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র প্রাণনারায়ণ কোচবিহারের রাজা হন ও প্রায় তেত্রিশ বছর রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বকালের প্রথম দিকে মুঘল রাজপরিবারে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং তার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে তিনি নিজেকে স্বাধীন ব'লে ঘোষণা করে মুঘলদের কাছে কর পাঠানো বন্ধ করে দেন। রাজ্যবিস্তারের আকাঙ্ক্ষায় তিনি কামরূপ আক্রমণ করে হাজো পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন। অহোমরাজ প্রাণনারায়ণের অভিসন্ধি বুঝতে পেরে প্রতি-আক্রমণ করে গৌহাটী পুনর্দখল করে নিলেন। এদিকে প্রাণনারায়ণও ধুবড়ী অধিকার করলেন। অহোমরাজের সঙ্গে যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত প্রাণনারায়ণ পরাজিত হন। এর কিছুকাল পরে (১৬৬১ খ্রীঃ) মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের সুদক্ষ সেনাপতি ও বাংলার সুবাদার মীরজুমলা কোচবিহার, আসাম (অহোম) প্রভৃতি রাজ্য জয় করার ইচ্ছায় ঢাকা থেকে রওনা হয়ে সহজেই এ দুটি রাজ্য অধিকার করে নেন। কোচবিহারের রাজধানী অবরুদ্ধ হবার আগেই প্রাণনারায়ণ রাজ্যত্যাগ করে ভুটানের দিকে পালিয়ে যান। পরে মুঘলসৈন্য আসামে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলে তিনি আবার নিজের রাজ্যে ফিরে আসেন। এর কিছু পরে শায়েস্তা খাঁ বাংলার সুবাদার হয়ে আসেন ও আবার কোচবিহার, আসাম প্রভৃতি রাজ্য আক্রমণের আয়োজন করতে থাকেন। দূরদর্শী প্রাণনারায়ণ নিজরাজ্যকে বাঁচাবার জন্য মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করে মুঘল দরবারে নিয়মিত কর পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এ ঘটনার কিছু পরেই (১৬৬৫ খ্রীঃ) প্রাণনারায়ণের

মৃত্যু হয়। তাঁর পুত্র মোদনারায়ণ মাত্র পনেরো বছর রাজত্ব করেন। ইনি অত্যন্ত দুর্বল রাজা ছিলেন ব'লে তাঁর রাজত্বকালে নাজীরদেও ও তাঁর দুই পুত্র রাজার নামে রাজ্যশাসন করতেন। এঁরা এত অত্যাচারী ছিলেন যে প্রজারা তাঁদের বিরুদ্ধে একবার বিদ্রোহ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। মোদনারায়ণের পর বসুদেবনারায়ণ মাত্র দু'বছরের জন্য রাজা হন। তারপরে বালক মহীন্দ্রনারায়ণ রাজা হয়েছিলেন ও প্রায় বারো বছর রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর সময়েও নাজীরদেওর দুই পুত্র আসল ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। ফলে, পুনরায় রাজ্যে প্রজা-অসন্তোষ ও নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। কোচবিহারের আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগ নিয়ে বাংলার সুবাদার পর পর তিনবার আক্রমণ করে এ রাজ্যের কিছু অংশ দখল করে নেন। মুঘলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য কোচবিহার সরকার ভুটানের সাহায্য ভিক্ষা করেন ও প্রায় তিন বছর সম্মিলিতভাবে মুঘল আক্রমণ প্রতিহত করেন। কিন্তু এই যুদ্ধে মুঘল বাহিনী কোচবিহারের আরও কিছু অংশ দখল করে নেয়। মহীন্দ্র-নারায়ণের মৃত্যুর (১৬৯৪ খ্রীঃ) পরেও কোচবিহারে বিশৃঙ্খল অবস্থা চলতে থাকে। ১৬৯৪ থেকে ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কোচবিহারে কোনও রাজা ছিলেন না। ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে মহীন্দ্রনারায়ণের পুত্র রূপনারায়ণ কোচবিহারের রাজা হন। তিনিও মুঘলের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে লাগলেন, কিন্তু মুঘলবাহিনী কোচবিহারের আরও কিছু অংশ দখল করে নিল। প্রায় সাত বছর যুদ্ধ চলার পর ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে মুঘলরাজশক্তির সঙ্গে রূপনারায়ণের এক সন্ধি হয় ও তার শর্তানুযায়ী কোচবিহাররাজ বিজিত তিনটি চাকলা ফিরে পান কিন্তু তাঁকে মুঘল-দরবারে কর পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিতে হয়। কোচবিহাররাজ তাঁর নিজের নামে মুদ্রা তৈরী করবার অধিকারও পান। এই সময়ের স্বাধীন কোচবিহার রাজ্যের আয়তন বৃটিশশাসিত সামন্তরাজ্য কোচবিহারের অনুরূপ ছিল। কিছুকাল পরে রূপনারায়ণ বাংলার নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর সঙ্গে মিতালি করেন। ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে রূপনারায়ণের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র উপেন্দ্রনারায়ণ রাজা হন ও প্রায় পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করেন। ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কোচবিহার রাজ্যে অন্তর্বিদ্রোহ দেখা দিলে মুঘলশক্তি ওই রাজ্য আক্রমণ করেন। তখন রাজধানী ছিল ধলিয়াবাড়ি বা ধলুয়াবাড়িতে। মুঘলবাহিনী এ রাজধানী অবরোধ করে। উপেন্দ্রনারায়ণ ভুটানরাজের সহায়তায় অন্তর্বিদ্রোহ দমন

করে মুঘল সৈন্যকে কোচবিহার রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেন। মুঘলের সঙ্গে কোচবিহারের বোধ হয় এই শেষ যুদ্ধ। রাজ্যকে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিদেশীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার জন্য কোচবিহার সরকারকে প্রায়শই ভুটানের উপর নির্ভর করতে হত ব'লে কোচবিহারে ভুটিয়া আধিপত্য ও আনুষঙ্গিক দৌরাত্ম্য বেড়ে যায়। এই দুঃসহ অবস্থা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য কোচবিহার রাজসরকারকে ইংরেজের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হয়। কিন্তু এর পরিণামও ভাল হয় না, কেন না ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের এক সন্ধি অনুযায়ী কোচবিহার রাজ্যের রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্ব ইংরেজ সরকারের উপর অর্পিত হয় এবং পরিশেষে কোচবিহার রাজ্যটি ইংরেজদের অধীনে এক করদ মিত্ররাজ্যে পরিণত হয়।

উপেন্দ্রনারায়ণের পরে হরেন্দ্রনারায়ণ ছাড়া আর কোনও শক্তিশালী রাজা কোচবিহারে রাজত্ব করেন নি। মুদ্রাপ্রচলনের অধিকার নিয়ে হরেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের মতবিরোধ দেখা দেয়। (এ বিষয়ে গ্রন্থের পরিশিষ্টে "নারায়ণী মুদ্রা" নামক নিবন্ধটি দ্রষ্টব্য।) উপেন্দ্রনারায়ণের পরে কোচবিহারের যাঁরা রাজা হন তাঁদের নাম, যথাক্রমে, দেবেন্দ্রনারায়ণ, ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ, রাজেন্দ্রনারায়ণ, ধরেন্দ্র-নারায়ণ, ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ (দ্বিতীয় বার), হরেন্দ্রনারায়ণ, শিবেন্দ্রনারায়ণ, নরেন্দ্রনারায়ণ, নৃপেন্দ্রনারায়ণ, রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ, জিতেন্দ্রনারায়ণ ও জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ। জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণের (অধুনা মৃত) সময় ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়। স্বাধীন ভারত সরকারের সঙ্গে কোচবিহার রাজের (জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ) রাজ্যটির ভারতভুক্তি সম্পর্কে এক চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং কোচবিহার রাজ্য ভারতরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১ জানুয়ারী থেকে এই রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্বর্তী এক জেলায় পরিণত হয়েছে।

কোচবিহার জেলার সদর কার্যালয় কোচবিহার শহরে অবস্থিত। একজন ডেপুটি কমিশনার এই জেলার প্রশাসন পরিচালনা করেন। তাঁর অধীনে যে পাঁচজন মহকুমা-শাসক আছেন তাঁরা কোচবিহার সদর, তুফানগঞ্জ, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা ও মেখলিগঞ্জ মহকুমার প্রশাসনের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। কোচবিহার সদর ও তুফানগঞ্জ মহকুমার প্রত্যেকটির অধীনে একটি করে ও বাকী তিনটি মহকুমার প্রত্যেকটির অধীনে দুটি করে থানা আছে—যথা, দিনহাটা মহকুমার অধীনে

দিনহাটা ও সিতাই, মাথাভাঙ্গা মহকুমার অধীনে মাথাভাঙ্গা ও শীতলকুচি এবং মেখলিগঞ্জ মহকুমার অধীনে মেখলিগঞ্জ ও হলদিবাড়ি থানা।

স্থানীয় পুরাকীর্তি ও ধর্মজীবনের রূপরেখা: নানাবিধ প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক কারণে এই জেলার অনেক পুরাকীর্তি নষ্ট বা ধ্বংস হয়ে গেছে। যেসব পুরাবস্তু বা পুরাকীর্তি এখনও বর্তমান, তাদের কোনটিই খুব পুরানো নয়—পাল-পূর্ব যুগের তো নয়ই। প্রাক্-পালযুগের কোচবিহারের অধিবাসী, রাজবৃন্দ ও তাঁদের ধর্ম ও সংস্কৃতি-বিষয়ে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ। পাথরে খোদাই-করা যেসব দেবদেবীমূর্তি পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে বিষ্ণু, সূর্য, উমা-মহেশ্বর ও নবগ্রহই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মূর্তিশিল্পের বিচারে এগুলিকে পালযুগের শেষের দিক ও সেনযুগের প্রথম দিকের ব'লে অনুমান করা যেতে পারে। পূজা বা অলংকরণের জন্য এই সব মূর্তি ব্যবহৃত হয়ে থাকলে এমন অনুমান অসঙ্গত নয় যে এ জেলায় পাল-সেন যুগে হিন্দুধর্মে অনুরাগী লোকজন ও রাজবৃন্দ বাস করতেন।

এই জেলার অনেক জলাশয় ও নদী থেকে বহু দেবদেবীর মূর্তি, মুদ্রা ও অন্যান্য পুরাবস্তু পাওয়া গেছে। মুদ্রা ও অন্যান্য পুরাবস্তুগুলিকে অবশ্য খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের পূর্ববর্তী বলা চলে না। এদের মধ্যে অনেকগুলি আবার আক্রমণকারী মুসলমান রাজাদের নামাঙ্কিত। খেনরাজাদের রাজধানী কামতাপুর থেকে অনেক পাথরের মূর্তি, পুরাবস্তু ও অন্যান্য পুরাকীর্তির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এগুলি পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্মিত বলে মনে হয়। খেন ও খেন-পরবর্তী যুগে খেন ও কোচবংশীয় রাজারা এখানে অনেক মাটির, ইটের ও পাথরের দুর্গ বা গড় নির্মাণ করেছিলেন। বর্তমানে সেসব প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এবং অনেকগুলি ভুটান, বাংলাদেশ, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। খেন ও কোচ-রাজারা অনেক জলাশয়, সেতু ও রাস্তাও নির্মাণ করেছিলেন যার কোন-কোনটির ধ্বংসাবশেষ বা চিহ্ন এখনও বিদ্যমান। খেনরাজাদের দ্বারা নির্মিত মন্দিরের কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায়। কোচ-রাজাদের নির্মিত অনেক মন্দির এখন ধ্বংস হয়ে গেলেও আগে তাদের সংখ্যা যে বেশ বেশী ছিল তাতে সন্দেহ নেই। কোচ রাজবংশের আদি রাজাদের মন্দির অবশ্য কোচবিহারে এখন বড় একটা দেখা

যায় না ; যেগুলি এখনও বর্তমান তার অধিকাংশই অধুনা আসামের কামরূপে অবস্থিত।

ইতিপূর্বে যেসব দুর্গ বা গড়ের কথা বলা হয়েছে তার বেশীর ভাগই সম্ভবত খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে নির্মিত। বৃহত্তর কোচবিহার বা কামতা রাজ্যে যেসব দুর্গ নির্মিত হয়েছিল তাদের মধ্যে ফেঙ্গুয়াগড়, বৈন্থের গড়, বিক্রমরাজার গড়, রওনাগড়, প্রতাপগড়, সাতপাড়গড়, পাঙ্গাগড়, রাজার গড়, গড় দলিপা বা জরিপা, কামতাপুর দুর্গ, কুমারীর কোট, ময়নামতীর কোট, পিঞ্জারির ঝাড় দুর্গ, আঠারকোঠা দুর্গ, বারো পাইকের গড়, বিশ্বসিংহের কেল্লা, মন্থনাকোট, হিঙ্গুলাকোট, চিলারায়ের কোট ও জালধোওয়া দুর্গ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এগুলির মধ্যে ফেঙ্গুয়াগড় ফেঙ্গুয়া নামে রাজা কামতেশ্বরের এক পৌত্র (খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকে ?), গড় দলিপা বা জরিপা দলিপ সামন্ত নামে জনৈক কোচ নায়ক (খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে ?), কামতাপুর, মন্থনাকোট, কুমারীর কোট, সাতপাড়-গড়, বারো পাইকের গড়, পিঞ্জারির ঝাড় দুর্গ (বড় ও ছোট), আঠার-কোঠা খেনরাজ নীলাম্বর (খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগে), বিশ্বসিংহ কেল্লা ও হিঙ্গুলাকোট কোচরাজবংশের আদিপুরুষ বিশ্বসিংহ এবং চিলারায়ের কোট ও জালধোওয়া দুর্গ কোচরাজ নরনারায়ণের ভ্রাতা শুক্লধ্বজ বা চিলারায়কর্তৃক নির্মিত হয়। ময়নামতীর কোট খুব সম্ভব গোপীচান্দের মাতা ময়নামতীর সৃষ্টি ও বৈন্থের গড় ও প্রতাপগড় রাজা অরিমত্ত বা আরিমত্তর তৈরী। এই রাজার রাজত্বকাল সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। বিক্রমরাজার গড় ঠিক কোন্ সময়ে নির্মিত হয়েছিল তা অজ্ঞাত হলেও মনে হয় এই রাজার সঙ্গে গর্দভিল্লবংশীয় রাজা বিক্রমাদিত্য বা গুপ্তবংশীয় সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের (বিক্রমাদিত্য বিরূধযুক্ত) কোনও সম্পর্ক ছিল না। কোচরাজ মল্লদেব বা নরনারায়ণের এক বিরূধ ছিল বিক্রমাদিত্য। সম্ভবত ইনিই ওই বিক্রমরাজের গড়ের নির্মাতা। কোচবিহার জেলায় বর্তমানে কামতাপুর ও চিলারায়ের কোট ছাড়া অন্য কোনও দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় না। কিছুকাল আগেও কুমারীর কোট ও জালধোওয়া দুর্গের যেটুকু ধ্বংসাবশেষ দেখা যেত, এক বিধ্বংসী বন্যার ফলে তার শেষ চিহ্নটুকুও লুপ্ত হয়ে গেছে। কুমারীর কোট সম্বন্ধে জনশ্রুতি খেনবংশীয়া আয়ী নামে পরিচিতা এক রাজকুমারী (রাজা নীলাম্বরের ভগ্নী ?) এই দুর্গে বাস করতেন। দুর্গটি ইটের ও প্রাচীরবেষ্টিত ছিল। চিলারায়-নির্মিত জালধোওয়া দুর্গটি স্থাপিত

হয়েছিল গদাধর নদের পাশে জালধোওয়া গ্রামে। ছোট ও আয়তাকারের এই দুর্গ থেকে চিলারায়-নির্মিত বেরবেরা বন্দরের দূরত্ব খুব বেশী ছিল না।

বর্তমানে কোচবিহার জেলায় খেন বা প্রাক্-খেনযুগের মন্দির দেখা যায় না। কারও কারও মতে খেনযুগে কামতাপুরের অন্তর্ভুক্ত রাজপাটে পাথরের বা ইটের মন্দির নির্মিত হয়েছিল। যদিও সেসব মন্দির এখন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, তবু রাজপাটের মাটির স্তূপের উপরে দেবদেবী প্রভৃতির মূর্তিসংবলিত যেসব পাথরের খণ্ড পাওয়া গেছে তা থেকে এমন ধারণা অসম্ভব নয় যে ওখানে একটি মন্দির ছিল। কামতাপুর দুর্গের নির্মাতা খেনরাজ নীলাম্বরই সম্ভবত ঐ মন্দিরটি স্থাপন করেন। এখন গোঁসানীমারিতে দেবী কামতেশ্বরী বা ভবানীর যে মন্দিরটি দেখা যায় সেটি কোচবিহার রাজবংশের মহারাজ প্রাণনারায়ণ ১৫৮৭ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মাণ করেন। 'বংশাবলী' ও 'বুরুঞ্জী'জাতীয় গ্রন্থে বিভিন্ন রাজাকে বিভিন্ন সময়ে এই মন্দিরের নির্মাতারূপে বর্ণনা করা হয়েছে (যেমন, খেনরাজবৃন্দ—নীলধ্বজ, চক্রধ্বজ ও নীলাম্বর এবং কোচরাজবৃন্দ—বিশ্বসিংহ, নরনারায়ণ ও প্রাণনারায়ণ)। এই সব কারণে মনে হয়, আদি কামতেশ্বরী মন্দিরটি খেনযুগে (পঞ্চদশ শতকে) নির্মিত হয়েছিল। সম্ভবত হোসেন শাহের আক্রমণে কামতাপুর তথা কামতেশ্বরী মন্দিরটি ধ্বংস হয়ে গেলে পরবর্তিকালে প্রথম দুজন কোচরাজা সেটির পুনর্নির্মাণ করেন। প্রাণনারায়ণের রাজত্বকালে ঐ মন্দির বোধ হয় মুসলমান আক্রমণের ফলে পুনরায় ধ্বংস হয়ে যায় (১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে মীরজুমলা কোচবিহার রাজ্য আক্রমণ করে বহু মন্দির ও দেবদেবীর মূর্তি ধ্বংস করেন)। তারপরে, ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে, প্রাণনারায়ণ পুনরায় মন্দিরটি নির্মাণ করেন। কামতেশ্বরী দেবীর মন্দির বোধ হয় সব সময়ে একই স্থানে নির্মিত হয়নি। অনেকের মতে রাজপাটের উপরেই কামতেশ্বরী দেবীর মন্দির ছিল। রাজপাট থেকে গোঁসানীমারির বর্তমান দেবমন্দিরের দূরত্ব প্রায় এক মাইল। বিশ্বসিংহ ও নরনারায়ণ কোচবিহার ও কামরূপে যেসব মন্দির নির্মাণ বা সংস্কার করেন তার মধ্যে কামতেশ্বরী মন্দির, কামাখ্যা মন্দির ও হাজোর হয়গ্রীব মাধব মন্দির উল্লেখযোগ্য। কোন কোন 'বংশাবলী'গ্রন্থে সুবিখ্যাত বাণেশ্বর শিবের মন্দিরটিকে রাজা নরনারায়ণের অন্যতম কীর্তি বলে উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু অন্য কয়েকটি গ্রন্থে এ মন্দিরের নির্মাতা বলা হয়েছে প্রাণনারায়ণকে। তিনি ও তাঁর ভ্রাতা শুক্লধ্বজ সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কামাখ্যাদেবীর মন্দির

ও এককভাবে কোচবিহারের নাককাটিগাছ ও বারকোদালিতে মহাদেবের (বাণলিঙ্গরূপ) মন্দির নির্মাণ করেন। অবশ্য নাককাটিগাছের যণ্ডেশ্বর শিবের মন্দির নির্মাণের ব্যাপারে যথেষ্ট মতপার্থক্য আছে। কারও কারও মতে কোচবিহারের একজন নাজীরদেও (খগেন্দ্রনারায়ণ ?) এটি স্থাপন করেন, আবার মতান্তরে, এটি প্রাণনারায়ণকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেকে মনে করেন, বারকোদালির মন্দিরটিও প্রাণনারায়ণ-কর্তৃক স্থাপিত। এসব মতামতের ভিত্তিতে অনুমান করা যেতে পারে যে প্রাণনারায়ণ বারকোদালি, নাককাটিগাছ ও বাণেশ্বরের মন্দিরগুলির পুনঃসংস্কার করেন। কোচবিহার শহরের অধুনালুপ্ত পুরাতন মদনমোহন মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতা সম্বন্ধেও অনুরূপ মতপার্থক্য আছে। বিভিন্ন মত অনুসারে, নরনারায়ণ, প্রাণনারায়ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ বা রূপনারায়ণ এ দেবালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু যাবতীয় তথ্য বিশ্লেষণ করে মনে হয়, নরনারায়ণ-স্থাপিত মন্দিরটি পরবর্তী রাজাদের সময়ে পুনঃসংস্কৃত হয়। মীরজুমলার কোচবিহার আক্রমণের সময় ধ্বংসপ্রাপ্ত মদনমোহনের আদি মূর্তি ও মন্দির পরে রাজা রূপনারায়ণের কালে পুনর্নিমিত হয়। কারও কারও মতে নরনারায়ণকর্তৃক স্থাপিত দেবমূর্তির নাম ছিল লক্ষ্মীনারায়ণ। কিন্তু এই মত গ্রহণযোগ্য নয় এইজন্য যে কোচবিহারের শঙ্করপন্থী বৈষ্ণবেরা (নরনারায়ণ প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবগুরু শঙ্করদেবের শিষ্য ছিলেন) বিষ্ণু বা নারায়ণের সঙ্গে লক্ষ্মীর পূজা অনুমোদন করতেন না। রূপনারায়ণ-প্রতিষ্ঠিত মদনমোহন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পুরানাবাসের প্রাচীন রাজপ্রাসাদে এখনও দেখা যায়। কোচবিহার শহরের বর্তমান মদনমোহন মন্দিরটি রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণকর্তৃক ১৮৮৯-৯০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়। কারও কারও মতে সিদ্ধেশ্বরী গ্রামের সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরটি প্রাণনারায়ণকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু স্থাপত্যরীতির বিচারে সেটিকে কোনমতেই অষ্টাদশ শতকের শেষভাগের পূর্ববর্তী বলে মনে হয় না। হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর মতে এ মন্দিরটি হরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের একেবারে শেষের দিকে বা উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে নির্মিত হয়েছিল। 'মধুপুরধাম বৃত্তান্ত' নামক একটি পুস্তিকায় রাজা নরেন্দ্রনারায়ণকে মধুপুরধামে উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি শঙ্কর (বা ভাগবত) ও গদাধরের উদ্দেশে দুটি মন্দিরের নির্মাতারূপে বলা হয়েছে। কেউ কেউ আবার নরনারায়ণকে শঙ্কর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ব'লে থাকেন।

মাধোস্বরূপ বৎস ও অশোক মিত্রের মতে হরিপুরের হরিহর মহাদেবের মন্দির ও ধলিয়াবাড়ির সিদ্ধনাথ শিবের মন্দির উপেন্দ্র-নারায়ণকর্তৃক নির্মিত হয়। কিন্তু হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বলেন, প্রথমটি ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণের সময়ে ও দ্বিতীয়টি শিবেন্দ্রনারায়ণের সময়ে নির্মিত হয়েছিল। উপেন্দ্রনারায়ণ ১৭১৪-১৭৬৩, ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ ১৭৬৫-১৭৭০ ও ১৭৭৫-১৭৮৩ এবং শিবেন্দ্রনারায়ণ ১৮৩৯-১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরা তাঁর পুস্তকের অন্যত্র আবার ধলিয়াবাড়ির শিবমন্দিরটির কাজ হরেন্দ্রনারায়ণের সময়ে (১৭৮৩-১৮৩৯ খ্রীঃ) আরম্ভ হয়েছিল বলে উক্তি করেছেন। তাঁর উক্তি যদি সত্য হয় তা হলে ধরে নিতে হবে এ মন্দিরটির কাজ হরেন্দ্রনারায়ণের সময়ে আরম্ভ হয়ে শিবেন্দ্রনারায়ণের সময়ে শেষ হয়। কিন্তু এ অনুমান হয়ত অসঙ্গত নয় যে মন্দিরটি উপেন্দ্রনারায়ণের সময়েই নির্মিত হয়েছিল, কেন না উপেন্দ্রনারায়ণের রাজধানী ছিল ধলিয়াবাড়িতেই। এ দেবালয়ের কাছে ইটের যে স্তূপটি এখনও দেখা যায় তা থেকে অনেকে অনুমান করে থাকেন যে সেটি উপেন্দ্রনারায়ণ-নির্মিত প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ মাত্র। সম্ভবত কোন প্রাকৃতিক বা রাজনৈতিক কারণে সে প্রাসাদ ধ্বংস হয়ে যায় এবং অদূরের সিদ্ধনাথ শিবের পঞ্চরত্ন মন্দিরের মূল রত্নটি একই সময়ে বিনষ্ট হয়। কেন না ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে হ্যামিলটন সাহেবের ধলিয়াবাড়ি পরিদর্শনের সময়েও মাঝের ঐ মূল রত্নটির অস্তিত্বই ছিল না। রাজপ্রাসাদের কোনও বিবরণীও তিনি লিপিবদ্ধ করে যান নি। ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রবল ভূমিকম্পে রাজপ্রাসাদ ও মন্দিরের এহেন ক্ষতি হয়েছিল বলেই মনে হয়। রাজনৈতিক কারণেও এ ক্ষতি হয়ে থাকতে পারে, কেন না ঐ একই বছরে রংপুরের ফৌজদার কোচবিহার রাজ্য আক্রমণ করেন ও ধলিয়াবাড়ি অবরোধ করেন। স্বর্গত মাধোস্বরূপ বৎসের মতে সিদ্ধনাথ শিবের মন্দিরে মুসলমান সংশ্রবের দুটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়—মূল রত্নটির গম্বুজের মত গড়ন ও মন্দিরের গর্ভগৃহের উত্তর দিকের দেওয়ালে মুসলমানী রীতিতে মিহরাব নির্মাণ। ধলিয়াবাড়িতে শাহ ফকির সাহেবের একটি মাজার বা কবর আছে। সাধারণের কাছে এটি ফকির সাহেবের আস্তানা বলেই পরিচিত। তিনি আনুমানিক অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে ধলিয়াবাড়িতে ধর্মপ্রচারের জন্য আসেন ও এখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

মহারাজ ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণের সময়ে রাজমাতার মদনগোপাল মন্দির ও দরিয়া বলরাম মন্দির নির্মিত হয়। প্রথমটি কোচবিহার শহরের পুরাতন রাজপ্রাসাদে ও দ্বিতীয়টি চিলাখানায় অবস্থিত ছিল। হরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে কোচবিহার রাজ্যে যেসব উল্লেখযোগ্য মন্দির বা বিগ্রহ স্থাপিত হয়, তাদের তালিকা নিম্নরূপ :—

(১) হিরণ্যগর্ভ মন্দির (কোচবিহার শহর), (২) আনন্দময়ী কালীমন্দির (মদনমোহন মন্দির-প্রাঙ্গণ, বৈরাগী দীঘি, কোচবিহার শহর), (৩) জয়তারা, অন্নপূর্ণা, চণ্ডী ও পাটদেবতার সম্মিলিত মন্দির (মদনমোহন মন্দির-প্রাঙ্গণ, বৈরাগী দীঘি, কোচবিহার শহর), (৪) মহাকালশিব বিগ্রহ (ভবানী মন্দির, মদনমোহন মন্দির-প্রাঙ্গণ, বৈরাগী দীঘি, কোচবিহার শহর), (৫) রাধারমণ ও রাধাবিনোদ বিগ্রহ (পুরাতন রাজপ্রাসাদের অন্দরমহলের নিকটে, কোচবিহার শহর), (৬) দীনদয়াল বিগ্রহ (পুরাতন রাজপ্রাসাদের মদনমোহন মন্দির, কোচবিহার শহর), (৭) কৃষ্ণ, বলরাম ও লক্ষ্মীনারায়ণের বিগ্রহ (পুরাতন রাজপ্রাসাদের অন্দরমহলে, কোচবিহার শহর), (৮) নৃসিংহ ঠাকুরের মন্দির (নৃসিংহবাড়ি পল্লী, কোচবিহার শহর), (৯) গোবর্ধনধারী বিগ্রহ (নৃসিংহবাড়ি পল্লী, কোচবিহার শহর), (১০)•নৃসিংহঠাকুরের মন্দির (টাকাগাছ পল্লী, কোচবিহার শহর), (১১) সিদ্ধেশ্বরী মন্দির (সিদ্ধেশ্বরী গ্রাম), (১২) বৃক্ষোদ্ভবা ঠাকুরাণী বা কামাখ্যারূপিণী কামরাঙ্গা গাছ (সিদ্ধেশ্বরী মন্দির-প্রাঙ্গণ), (১৩) ক্রোটেশ্বর (ক্রোধেশ্বর ?) শিব মন্দির (আবুয়ার পাথার—পূর্বনাম উাড়য়ার পাথার ?), (১৪) জগেশ্বর শিব মন্দির (আবুয়ার পাথার), (১৫) বামাকালী মন্দির (গোঁসাইগঞ্জ), (১৬) জগন্নাথ মন্দির (পাটকুড়া পল্লী, গোঁসাইগঞ্জ), (১৭) ঘূর্ণেশ্বরী মন্দির (চামটা—পূর্বনাম ঘূর্ণেশ্বরী) ও (১৮) ঈশ্বরযন্ত্র (তারাবাড়ি)।

এছাড়া হরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে বিখ্যাত মুসলমান ফকির বা পীর তোর্সাবাবা বা তোর্সাপীরের মাজার বা কবর পাকা করে তার উপরে টিনের একটি চারচালার আচ্ছাদন দেওয়া হয়।

রাজা শিবেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে শিবপ্রসাদ গ্রামে জনৈক মন্ত্রীর বাড়ীর প্রাঙ্গণে এক অশ্বত্থ গাছের নীচে 'বৃক্ষোদ্ভবা ঠাকুরাণী'র পীঠ ও পুরানো রাজপ্রাসাদের অন্দরমহলে একটি রাধাবল্লভ বিগ্রহ স্থাপিত হয়। 'বৃক্ষোদ্ভবা ঠাকুরাণী'কে কামাখ্যাজ্ঞানে পূজা করা হত। কিন্তু শিবপ্রসাদ গ্রামের ও সিদ্ধেশ্বরী গ্রামের এই তথাকথিত পীঠ দুটি

নিতান্তই আঞ্চলিক ; এদের কথা 'পীঠনির্ণয়' বা অন্য কোনও গ্রন্থে দেখা যায় না। ['পুরাকীর্তি পরিচিতি' পরিচ্ছেদে এসব পুরাকীর্তির বিস্তৃততর বিবরণ দেওয়া হয়েছে।]

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, হরেন্দ্রনারায়ণ ছাড়া আর কোন কোচবিহারের রাজা এত বেশীসংখ্যক মন্দির নির্মাণ করেন নি। হরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালকে তাই কোচবিহারের 'মন্দির নির্মাণের স্বর্ণযুগ' বললে অত্যুক্তি হয় না। পরবর্তীকালে রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ ও নৃপেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে কোচবিহারে আরও কিছু মন্দির নির্মিত হয়েছিল। নরেন্দ্রনারায়ণের সময়ে নির্মিত অনাথনাথ শিবের মন্দিরটিই উল্লেখযোগ্য। নৃপেন্দ্রনারায়ণের সময়ে মদনমোহন, কালী, তারা ও রাজমাতার মন্দির নির্মিত হয়। নৃপেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে বিখ্যাত ব্রাহ্মধর্মপ্রচারক কেশবচন্দ্র সেন কোচবিহার পরিদর্শন করেন। পরে রাণী সুনীতিদেবীর আগ্রহে নৃপেন্দ্রনারায়ণ একটি ব্রাহ্মমন্দির ও একটি আশ্রম নির্মাণ করেন। আশ্রমটি কেশবচন্দ্র সেনের নামে উৎসর্গ করা হয়। কোচবিহার শহরে ডাঙ্গর আয়ী ঠাকুরবাড়ি (বা গুঞ্জাবাড়ি) নামে যে মন্দিরটি দেখা যায় সেটি শিবেন্দ্রনারায়ণের বড় রাণী ('ডাঙ্গর আয়ী') কামেশ্বরী দেবীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

মন্দির নির্মাণের ব্যাপারে কোচবিহারের রাজারাই যে শুধু আগ্রহ দেখিয়েছিলেন তা নয়, তাঁদের নাজির ও দেওয়ানরাও সমান উৎসাহী ছিলেন। এই প্রসঙ্গে ঢোপগুড়ির বলরাম মন্দির, অরুণী বা আয়ীরাণী চিতলিয়ার (পূর্বনাম চিথলিয়া-দলবাড়ি) চণ্ডী মন্দির ও ধলিয়াবাড়ির জগমোহন ঠাকুরের মন্দির উল্লেখযোগ্য। প্রথম দুটি মন্দির একজন নাজিরদেওকর্তৃক নির্মিত হয়। তার কি নাম ছিল তা সঠিকভাবে বলা শক্ত, তবে অনেকে অনুমান করেন, রাজা ধরেন্দ্রনারায়ণের নাজির খগেন্দ্রনারায়ণই এগুলির নির্মাতা। তৃতীয় মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আর একজন অজ্ঞাতনামা দেওয়ানদেও। ভুচুংমারি বা আবস্থলির বলরাম ঠাকুরের পাকা মন্দিরটি (অধুনা ভগ্ন) কার সময়ে নির্মিত তা বলা কঠিন, তবে অনেকে অনুমান করেন, এটি হরেন্দ্রনারায়ণ বা তাঁর পুত্র শিবেন্দ্রনারায়ণের সময়ে স্থাপিত হয়ে থাকবে। কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ, মেখলিগঞ্জ, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, হলদিবাড়ি ও কোচবিহার শহরের প্রত্যেকটিতেই একটি করে মদনমোহন মন্দির আছে। এগুলির মধ্যে দিনহাটা ছাড়া অন্য স্থানের মদনমোহন মন্দিরগুলি আঠারো-

উনিশ শতকে কোচবিহারের রাজাদের দ্বারা নির্মিত। দিনহাটার মন্দিরটি মীরেরকুঠি-নিবাসী ধৈর্যনাথ সরকার ১৩১৪ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯০৬-৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্মাণ করেন।

কোচবিহার জেলার স্থাপত্য-ভাস্কর্য ঃ উল্লেখিত মন্দিরগুলির কিছু ইটের তৈরী হলেও অধিকাংশই মাটির দেওয়াল ও টিনের চালযুক্ত ছিল। অনেক সময় মন্দিরের মেঝে ও দেওয়াল হত ইটের আর চাল হত টিনের বা খড়ের। অনেক সময় আবার মেঝে ইটের, দেওয়াল মাটি, কঞ্চি, নলখাগড়া, বা টিনের হত, আর চাল হত টিনের বা খড়ের। প্রাচীন মন্দিরগুলি সাধারণত চারচালা গড়নের হত। অবশ্য সমতল ছাদযুক্ত দালান-মন্দিরও কোচবিহার জেলার অনেক জায়গায় দেখা যায়। অধিকাংশ মন্দিরে বেতনভুক পূজারীরা নিত্যপূজা চালান। নির্দিষ্ট কিছু মন্দিরের নিত্যপূজার খরচ, পূজারী ও অন্যান্য মন্দির-কর্মচারীদের বেতন এবং নিয়মিত সংস্কারের খরচ কোচবিহারের দেবোত্তর বিভাগ থেকে দেওয়া হয়। কোচবিহারের দেবোত্তর বিভাগটি স্বাধীন কোচবিহার রাজ্যে পূর্ব থেকেই ছিল। এর একটি কার্যকরী সমিতিও আছে। এর প্রধান কার্যালয় কোচবিহার শহরের সাগরদীঘির পাশে অবস্থিত।

মাধোস্বরূপ বৎসের মতে কোচবিহারের বেশীর ভাগ ইটের মন্দিরে মুঘল প্রভাব দেখা যায়। তাঁর মতে মন্দিরগুলি বাংলা চারচালা মন্দিরের নির্মাণরীতির সঙ্গে সপ্তদশ শতকের মুঘল স্থাপত্যের সংমিশ্রণে গঠিত। পশ্চিমবঙ্গের আর কোন জেলায় মন্দিরের উপরে মসজিদের অনুকরণে গম্বুজ স্থাপিত হয় নি। কোচবিহারের কোন কোন মন্দিরের বাইরের দেওয়ালের চার কোণে চারটি মিনারের মত অট্টালক বা সরু থাম দেখা যায়। দেওয়ালে চুনবালির পলস্তারা ছাড়া সূক্ষ্ম কোন শিল্পকাজ থাকত না। শিল্পকাজ বলতে দেওয়ালে খাড়া ও আড়াআড়িভাবে কয়েকটি সমান্তরাল খাঁজ বা পটি (অনেক ক্ষেত্রে উদ্গত) ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। অল্প কিছু মন্দিরের দেওয়ালে এইরূপ খাঁজ থাকার জন্য অনেকগুলি চৌকো খোপের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সেসব খোপে পোড়ামাটি বা অন্য কিছুর নকশা বা মূর্তিযুক্ত ফলক নেই।

বাঁশের সাহায্যে কুটির বা কুঁড়েঘর নির্মাণের রীতিটি উভয় বাংলায় খুব প্রাচীনকাল থেকেই অনুসৃত হয়ে এসেছে। প্রচণ্ড বর্ষার বারিধারা

সহজে গড়িয়ে পড়বার ও নির্মাণের সুবিধার জন্য এইসব কুটিরের ছা বা চাল ঢালু ধরনের হত। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতক বা তার আগে থেকে বঙ্গদেশে ইটের মন্দির নির্মাণেও এই রীতিটি অনুসৃত হয়েছে। সেজন্য এ অঞ্চলে প্রায় সুরু থেকেই দোচালা, চারচালা ও আটচালা মন্দি নির্মিত হতে আরম্ভ হয়। এসব মন্দিরের চাল ও কার্নিস বাঁকাভা নির্মিত হত। মুঘলযুগের বহু প্রাসাদে (বিশেষত রাজস্থানে) ও কি মসজিদের স্থাপত্যরীতিতে চালারীতির প্রভাব দেখা যায়। চালা মন্দিরের চাল ও কার্নিসগুলিকে সাধারণত কূর্মপৃষ্ঠের মত বক্রাকৃতি ব অনুভূমিক এই দু'ভাগে ভাগ করা যায়। কূর্মপৃষ্ঠাকৃতি ঢালু ছাদ ব বাঁকা কার্নিস ছাড়াও বাংলা চালা-মন্দিরের অন্য বিশেষত্ব হল, অল্প উঁচু ভিত্তিবেদীর ব্যবহার, গর্ভগৃহ ও কোন কোন ক্ষেত্রে তৎসংলগ্ন ঢাক বারান্দা, তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশপথ, ফুলকাটা বা পত্রাকৃতি (ঢেউ-খেলানো স্তরযুক্ত) এক বা একাধিক নকাশি-থাকযুক্ত খিলান, তিনটি খিলান ধারণের জন্য আটকোণা চারটি থাম (মাঝের দুটি পুরা বা পূর্ণস্তম্ভ আর ধারের দুটি অর্ধেক বা অর্ধস্তম্ভ), দেওয়ালের গায়ে সারিবদ্ধভাবে পোড়ামাটির অলংকরণ (অবশ্য সব মন্দিরের দেওয়ালে এ জাতীয় অলংকরণ থাকে না), আটচালা মন্দিরে চারচালার উপর আর একটি ক্ষুদ্রতর চারচালার পুনরাবৃত্তি ও পরিশেষে ছাদ ধারণের বিশেষ পদ্ধতি। উত্তর-মুসলিম যুগে চালা বা রত্ন-মন্দিরের ছাদ ধারণের যে বিশেষ পদ্ধতিটি বঙ্গদেশে অনুসৃত হয়েছে তা নিশ্চিতভাবে মুসলমানী রীতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, কেন না এই রীতিতে মন্দিরের গর্ভগৃহের ছাদের ভিতরের দিক গম্বুজাকৃতি করে নির্মাণ করাই প্রচলিত পদ্ধতি ছিল। 'বাঁকুড়ার মন্দির'-প্রণেতা শ্রীযুত অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এই রীতিতে ছাদ নির্মাণ করার জন্য স্থপতিকে মন্দিরের খাড়া দেওয়ালের চার কোণে, প্রয়োজনীয় উচ্চতায়, লহরার বিন্যাস করে তার উপর বৃত্তাকার গম্বুজের মূল স্থাপন করতে হত। তারপর গম্বুজের প্রতি স্তর ইট ধাপে ধাপে একটু একটু করে এগিয়ে গোলার্ধাকার গম্বুজকে এক শীর্ষবিন্দুতে মিলিয়ে দিতে হত। অনেক ক্ষেত্রে, মন্দিরের গর্ভগৃহের লহরাযুক্ত চার দেওয়ালের উপর সরাসরি গম্বুজ না বসিয়ে দেওয়ালসংলগ্ন দুই বা ততোধিক চওড়া খিলান বানিয়ে তার উপরেও অপেক্ষাকৃত ছোট গম্বুজ স্থাপিত হত। মুসলিম-পরবর্তিকালে, ইটের তৈরী অধিকাংশ হিন্দু-মন্দিরের ছাদ এভাবেই নির্মিত হয়েছে।

কোচবিহারের বেশীর ভাগ মন্দিরের ছাদও এভাবে নির্মিত। তবে সেখানকার মন্দিরগুলির বিশেষভাবে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে বাহিরের দিকে ছাদ চালা বা রত্নের আকৃতি না নিয়ে গম্বুজের আকৃতিই নিয়েছে, অর্থাৎ বাহির ও ভিতর উভয়ই হয়েছে গম্বুজাকৃতি। বাণেশ্বর শিব মন্দিরের ছাদের গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে মাধোস্বরূপ বৎস যে মন্তব্য করেছেন তা এখানে প্রাসঙ্গিক। সেখানে দরজার সামান্য উপর থেকে দেওয়ালগুলি কিছুটা খাড়াভাবে উঠে গেছে, তারপর অবশ্য দেওয়ালের সোজা খাড়াভাবটি কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে আটকোণাকৃতি হয়ে খিলান অবধি উঠে গেছে। এই আটকোণাকৃতি স্থাপত্যকার্যের প্রত্যেকটি কোণের উপরে একটি করে খিলান তৈরী করে তার মাঝখান থেকে লহরার বিন্যাসে সর্বোচ্চ অংশটিকে বৃত্তের আকার দেওয়া হয়েছে এবং তার উপরই গম্বুজের মূল স্থাপন করা হয়েছে। বৃত্তের উপরে পর পর গ্রীবা বা বেঁকি, গোলার্ধাকার গম্বুজ, পদ্ম, নলাকার আমলক, কলস ও ত্রিশূল স্থাপন করা হয়েছে। অনেক সময় খিলানের উপর ক্ষুদ্রাকার ও উদ্গত পটির মত অলংকরণ দেখা যায়, যেমন কামতেশ্বরী মন্দিরে। অন্যত্র আবার গম্বুজের নীচে কোনও বেঁকি বা গ্রীবা থাকে না, যেমন সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরটি আটকোণাকার হওয়ায় সেখানে বেঁকি রাখার প্রয়োজন হয় নি।

কোচবিহারের কোনও মন্দিরের গর্ভগৃহের সামনে ঢাকা বারান্দা নেই বা তিন-খিলানযুক্ত থামওয়ালা প্রবেশপথও নেই। ধলিয়াবাড়ির সিদ্ধনাথ শিব মন্দিরটি ছাড়া আর সর্বত্রই পোড়ামাটির অলংকরণও অনুপস্থিত। এমন কি সিদ্ধনাথ শিবের পঞ্চরত্ন মন্দিরটি ছাড়া অন্য কোন রত্ন-মন্দির বা আটচালা কিংবা দোচালা মন্দিরেরও অস্তিত্ব নেই।

কোচবিহার অঞ্চলে একটি জনশ্রুতি আছে (কোন কোন 'বংশাবলী' গ্রন্থেও এর উল্লেখ দেখা যায়), যে সতেরো শতকে রাজা প্রাণনারায়ণ কামতেশ্বরী ও জলপাইগুড়ি জেলার জল্পেশ্বর মন্দির নির্মাণের কাজে দিল্লী থেকে স্থপতি আনিয়েছিলেন। তাঁরা হয়ত মুসলমান ছিলেন। এ দুটি মন্দিরের গম্বুজাকৃতি ছাদ (ভিতরে ও বাইরে) সম্ভবত তাঁদের স্বকীয় স্থাপত্যরীতির পরিচায়ক। ধলিয়াবাড়ির সিদ্ধনাথ শিব মন্দিরের দেওয়ালে যে 'মিহরাব'টি দেখা যায় সেটিও মুসলিম স্থাপত্যরীতি দ্বারা প্রভাবিত।

স্থানীয় স্থাপত্য-ভাস্কর্যে ধর্মীয় প্রভাব : হিন্দু-রাজ্য কোচবিহারে মন্দিরের সংখ্যা স্বভাবতই বেশী। শিব, বিষ্ণু ও তাঁর দুই অবতার

কৃষ্ণ (নানা নামে) ও বলরাম, দুর্গা, কালী এখানে বিশেষ জনপ্রিয় ব'লে তাঁদের মন্দিরের সংখ্যাই সমধিক। এছাড়া অনেক অনার্য দেবদেবীর মন্দিরও এখানে দেখা যায়। জনশ্রুতি, কোচবিহারের রাজা বিশ্বসিংহ শিব-দুর্গার উপাসক ছিলেন এবং কালীচন্দ্র ভট্টাচার্য নামে এক ব্রাহ্মণ তাঁকে শৈব মতে দীক্ষা দেন। কনৌজ, কাশী ও পুরী থেকে অনেক ব্রাহ্মণকে এনে তিনি তাঁর রাজ্যে বসতি করান। রাজা নরনারায়ণ শিবভক্ত ছিলেন। তবে অনেকের মতে তিনি বৃদ্ধ বয়সে শঙ্করদেবের প্রভাবে প'ড়ে বৈষ্ণব হন। শুক্লধ্বজও নাকি একইভাবে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন। লক্ষ্মীনারায়ণ, প্রাণনারায়ণ প্রভৃতি রাজারা যে শৈব ছিলেন সেকথা তাঁদের মুদ্রা থেকেই জানা যায়। খেনরাজাদের মত কোচরাজাদের অন্যতম উপাস্যা দেবী ছিলেন কামতেশ্বরী বা ভবানী। কোচবিহারের রাজারা যে বিষ্ণু-কৃষ্ণেরও পূজা করতেন বা এখনও করেন তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ তাঁদের কুলদেবতা মদনমোহন। প্রতি বছর রাস ও শারদীয়া দুর্গাপূজার সময় কোচবিহারের রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় মহা ধুমধামে মদনমোহনের রাসযাত্রা ও দুর্গা বা ভবানীদেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ থেকে মনে হয়, মধ্যযুগের অনেক হিন্দুর (বিশেষত বাঙ্গালীর) মত কোচবিহারের রাজারাও স্মার্ত ছিলেন ও বিশেষ কোন হিন্দু দেবদেবীর একান্ত সাধক বা ভক্ত ছিলেন না। ধর্মের দিক দিয়েও তাঁদের কোন গোঁড়ামি ছিল বলে মনে হয় না।

কোচবিহারে জৈনধর্মানুরাগীদের সংখ্যা যদিও সামান্য তবুও সম্প্রতিকালে কোচবিহার শহরে দুটি জৈনমন্দির নির্মিত হয়েছে।

কোচবিহার শহরে, কয়েক বছর আগে মার্কিনী খ্রীষ্টানদের অর্থসাহায্যে স্থাপিত, একটিমাত্র গির্জা আছে। এটির নাম 'নিউ ডিস্পেন্সন চার্চ'। আগে, শহরের নীলকুঠি অঞ্চলে, ইংরেজ খ্রীষ্টানদের উপাসনার জন্য একটি অপেক্ষাকৃত পুরাতন গির্জা ছিল। অধুনা সেটির অস্তিত্ব নেই।

কোচবিহার জেলায় মুসলমানদের যেসব, মসজিদ, দরগা এবং মাজার বা কবর আছে, তার মধ্যে কোচবিহার শহরের পৌর এলাকার বাইরে গুদাম মহারানীগঞ্জে তোর্সাপীরের ধাম (কবর) ও হলদিবাড়ির পীর একরামুল হকের মাজার বিশেষ প্রসিদ্ধ। এছাড়া কোচবিহার শহরের পুরানী মসজিদ, গুদাম মহারানীগঞ্জের মসজিদ, খাগড়াবাড়ির মসজিদ, ধলিয়াবাড়ির শাহ ফকিরের আস্তানা, বাঘদুয়ারের শাহ গরীব কামালের আস্তানা, শিবপুরের মসজিদ প্রভৃতিও উল্লেখযোগ্য।

ঠিক কোন্ সময়ে কোচবিহারের অধিবাসীরা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন তা বলা শক্ত, তবে রাজা বিশ্বসিংহ যে হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী হয়ে শৈবমতে দীক্ষিত হন তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর প্রজারাও যদি একই সঙ্গে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে থাকেন (যা হওয়া স্বাভাবিক) তা হলে মনে হয় খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কোচবিহারে হিন্দুধর্মের ব্যাপক প্রসার হয়। অবশ্য তার আগেও কোচবিহার বা কামতারাজ্যে হিন্দুধর্মাবলম্বীদের অস্তিত্বের প্রমাণ খেনরাজাদের ধর্মবিশ্বাস ও তাঁদের দ্বারা হিন্দু দেবদেবীর মন্দির ও মূর্তিনির্মাণের সূত্র থেকে পাওয়া যায়। পাল-সেন যুগের আবিষ্কৃত হিন্দুদেবদেবীর মূর্তিও প্রমাণ করে এই রাজ্যে সে যুগে হিন্দুধর্মানুরাগী লোকের বাস ছিল। অন্যদিকে এখানকার অনেক উচ্চবর্ণের হিন্দুও অনার্য আঞ্চলিক দেবদেবীর উপাসনা করে থাকেন। এখানে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনে ও ধর্মবিশ্বাসে এত বিধি-নিয়মগত ও মতবাদগত পার্থক্য আছে যে, সেসব সূত্র ধ'রে কে হিন্দু আর কে অহিন্দু তা বলা শক্ত। উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে ও খাদ্য বা পানীয় গ্রহণের ব্যাপারে এই পার্থক্য বেশ ভালভাবেই লক্ষ্য করা যায়। কোচবিহারে আঞ্চলিক বা লৌকিক দেবদেবীর পূজা ও হিন্দুদের পুরাণ বা তন্ত্রোক্ত দেবদেবীর পূজা পাশাপাশিই চলে এসেছে। এসব দেবদেবীর পূজার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই কোন পাকা বা কাঁচা মন্দির অথবা নির্দিষ্ট স্থান থাকে না। অনেক সময় গাছের নীচে, শ্মশানে পথের ধারে, নদীতীরে বা কোনও উন্মুক্ত স্থানে এঁদের পূজা হয়ে থাকে। আবার অন্যত্র এঁদের উপাসনা হয় টিনের বা মাটির চারচালা বা দোচালা মন্দিরে। সাধারণত লৌকিক বা আঞ্চলিক দেবদেবীদেরই এইভাবে পূজা হয়ে থাকে। তাঁদের যে স্থানে বা মন্দিরে পূজা হয় সে স্থান বা মন্দিরকে 'থান' অথবা 'পাট' বলে। অনেক সময় এসব মন্দির বা পূজার স্থানে একসঙ্গে একাধিক দেবদেবীর পূজা হয় বা একই জায়গায় বিভিন্ন দেবতার পূজা বিভিন্ন পর্বে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বহু ক্ষেত্রেই দেবদেবীদের পাথর, ধাতু বা অন্য উপাদানের কোন স্থায়ী মূর্তি থাকে না। পার্বণ উপলক্ষে, অনাবৃষ্টির সময়ে, মহামারীর কালে ও বিশেষ কোনও কারণে (মানসিক প্রভৃতি থাকলে), এই সব দেবদেবীর মাটির মূর্তি নির্মাণ করে পূজা করা হয়। অনেক দেবদেবীর ক্ষেত্রে মূর্তির বদলে প্রতীক উপসনার রীতি আছে। সেক্ষেত্রে ত্রিশূল, পাথরখণ্ড বা বিশেষ কোন গাছকে দেবতাজ্ঞানে

অর্চনা করা হয়। বহু লৌকিক দেবদেবীর পূজায় পুরোহিতের কোন দরকার হয় না। কোচবিহার জেলায় প্রতাপশালী লৌকিক দেবদেবী হলেন মশানদেবতা, গাবুরদেব, কুমিরদেব, হুহুমদেও বা হুড়ুমদেও (বরুণ ?), বুড়াবুড়ী, বুড়ীমা, জকা-জকিনী, ড্যাং-ধরাদেব, ঢিং-ঢাং ঠাকুর, বুড়া ঠাকুর, সন্ন্যাসী ঠাকুর (শিব ?), ঢেলাদেব, বাবাঠাকুর (শিব ?), হাতিপোষা ঠাকুর, শালটিবাড়ী ঠাকুর, ব্যাঘ্রদেবতা, কোড়া-কুড়ি ঠাকুর, বাহাস্তো, বলীবর্দ ঠাকুর ও শাখাতি দেবী এছাড়া শীতলা, মনসা, সুবচনী, সত্যনারায়ণ, শ্মশানকালী প্রভৃতির আরাধনাও প্রচলিত।

মশানদেবতার স্ত্রী ও পুরুষ দুই রূপই আছে। স্ত্রীরূপে তাঁকে কালীজ্ঞানে পূজা করা হয়। তখন তিনি সিংহবাহনা ও চতুর্ভুজা; পদতলে শিবের শয়ানমূর্তি। পুরুষদেবতারূপে তাঁকে শিব বা শিবানুচর কোনও অপদেবতাজ্ঞানে উপাসনা করা হয়। তিনি তখন দ্বিভুজ বা চতুর্ভুজ এবং শূকর বা ঘোড়া তাঁর বাহন। অমঙ্গল, মহামারী ও পথ-দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য এই দেবতার আরাধনা হয়ে থাকে। গোঁসানামারির কাছে আলোকঝারিতে এক প্রসিদ্ধ মশানপাট আছে। সেখানে একটি স্থায়ী ও বড় টিনের চৌচালা মন্দিরও আছে। এই মশানদেবতাটি শিবজ্ঞানে উপাসিত ও তাঁর বাহন শূকর। প্রধান মূর্তিটি ছাড়াও অনুরূপ ছোট ছোট মাটির মূর্তিও আছে, কেন না অনেকে দেবতার কাছে তাঁর মাটির মূর্তি মানত করে থাকেন। কোচবিহারের আর কয়েকটি গ্রামেও মশানপাট আছে। গাবুরদেব চতুর্ভুজ ও মহিষ-বাহন এবং কুমিরদেব দ্বিভুজ ও ব্যাঘ্রবাহন। খোলটা গ্রামে গাবুরদেব ও কুমিরদেবের পূজা হয়ে থাকে। গ্রামে অমঙ্গল বা মহামারী দেখা দিলে ঢেলাদেব ও বুড়াবুড়ীর অর্চনা করা হয়। কঠিন রোগ আরোগ্যের দেবতা জকা-জকিনী। বাঘের ভয় থেকে নিস্তার পাবার জন্য ড্যাং-ধরাদেব ও গরুর নিরাপদে প্রসবের জন্য বুড়ীমার পূজা হয়ে থাকে। এই সব লৌকিক দেবদেবীর পূজায় অনেক সময়ে পায়রা, ছাগল প্রভৃতি মানত করা হয় ও বলি দেওয়া হয়।

ভারতভুক্তির আগেকার কোচবিহার রাজ্যে স্থানীয় পুরাকীর্তি বা পুরাবস্তুর দেখাশোনা করবার জন্য একটি সংস্কৃতিবিষয়ক দপ্তর বা পুরাতত্ত্ব-দপ্তর খোলা হয়েছিল। কোচবিহারের ভারতভুক্তির পর এই দপ্তরের সম্ভবত অবলুপ্তি ঘটেছে। বর্তমানে কোচবিহার দেবোত্তর

সংস্থা বা বিভাগ এই জেলায় অবস্থিত অধিকাংশ মন্দিরের তত্ত্বাবধান করে থাকেন। এই বিভাগের অধীনে কেন্দ্রীয় দপ্তরে কাজকর্ম করার লোক ছাড়াও সেবায়েত, পূজারী, বড় দেউড়ী, দেউড়ী, রক্ষক, মালী, ভোগ-পাচক, লায়েক (বলির জন্য), সোয়াস্থলী (বাটনা বাটার জন্য) প্রভৃতি মন্দির-কর্মচারী আছেন। দেবদেবীদের সম্পত্তির আয় ও সরকারী সাহায্য থেকে তাঁদের বেতনাদি দেওয়া হয়। বর্তমানে মাত্র 'রাজপাট' নামক বিরাট ঢিবির অন্তর্নিহিত প্রত্নক্ষেত্রটি ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। পূর্বে টাঁকশাল নামক আর একটি প্রত্নক্ষেত্র ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে ছিল, কিন্তু পরে ভারত সরকারের নির্দেশে সেটি পরিত্যক্ত হয়।

কোচবিহার রাজ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধর্ম-প্রচারক এসেছেন। তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় নাথধর্মের প্রতিষ্ঠাতা (?) গোরক্ষনাথের। উত্তরবঙ্গে যেসব কিংবদন্তী ও গান প্রচলিত আছে তা থেকে জানা যায় গোরক্ষনাথ জল্পেশের কাছে জন্মেছিলেন। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিক থেকে এখানে মুসলমান ধর্মের প্রচার আরম্ভ হয়। এ অঞ্চলে যেসব পীর, গাজী ও ফকিরের কবর, আস্তানা বা দরগা আছে তাদের মধ্যে গাজী পীর, শাহ গরাব কামাল, শাহ ফকির, তোর্সা পীর, পীর একরাম্মুল হকের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁরা সম্ভবত এখানে ধর্মপ্রচার করতে আসেন ও পরে এখানেই দেহরক্ষা করেন। সোনা রায় ও রূপা রায় নামে অপর দুজন ধর্মপ্রচারকও এখানে আসেন বলে অনেকের বিশ্বাস। এঁদের আবির্ভাবের সময় সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে শিখগুরু নানক, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক চৈতন্যদেব, অসমীয়া বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক শঙ্করদেব এবং তাঁর দুই শিষ্য মাধবদেব ও দামোদরদেব এখানে ধর্মপ্রচার করতে আসেন—তবে প্রথম দু'জন সম্বন্ধে এই ধারণা কতদূর সত্য তা বলা কঠিন। কোচবিহারের বৈষ্ণবধর্ম প্রথম কে প্রচার করেন সে সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া শক্ত, তবে সাক্ষ্যপ্রমাণাদির ভিত্তিতে শঙ্করদেবকেই কোচবিহারে বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক বলা যায়। পরবর্তিকালে খ্রীষ্টধর্ম, জৈনধর্ম ও ব্রাহ্মধর্মও এখানে অল্পবিস্তর প্রচারিত হয়। ঊনবিংশ শতকের শেষ-ভাগে বিখ্যাত ব্রাহ্মধর্মপ্রচারক ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন যে কোচবিহারে ধর্মপ্রচারে এসেছিলেন সেকথার আগেই উল্লেখ করেছি।

পুরাকীর্তি পরিচিতি

কোচবিহার জেলায় প্রাপ্ত সবচেয়ে প্রাচীন পুরানিদর্শনের মধ্যে পাল-সেন যুগে নির্মিত কিছু কিছু দেবদেবীমূর্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খেন আমলের কামতাপুর প্রভৃতি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এখনও এ জেলার নানাস্থানে দেখা যায়। কোচযুগের পুরাকীর্তিও অল্পবিস্তর বিদ্যমান। মুসলমানী মুদ্রা ও কামানও কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে। কোচরাজাদের প্রচলিত 'নারায়ণী মুদ্রা'ও এখানে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া গিয়েছে। (এ বিষয়ে 'নারায়ণী মুদ্রা' শীর্ষক পরিশিষ্টটি দ্রষ্টব্য।)

বর্তমান অধ্যায়ে কোচবিহার জেলার পুরাকীর্তি, পুরাবস্তু ও জনপ্রিয় লৌকিক দেবদেবীর 'থান'-এর বর্ণানুক্রমিক বিবরণ দেওয়া হবে।

অন্দরান ফুলবাড়ি (তুফানগঞ্জ থানা)ঃ গ্রামটি মহকুমা শহর তুফানগঞ্জ বা ফুলবাড়ি থেকে মাত্র দেড় মাইল (২·৪ কিলোমিটার) উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ও জেলা-সদরের সঙ্গে পিচ-রাস্তাদ্বারা সংযুক্ত। এ পথে নিয়মিত বাস চলে। এখানে 'চিলারায়ের কোট' নামে একটি পুরানো দুর্গ বা গড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এটি মহারাজ নরনারায়ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা চিলারায় (সংগ্রামসিংহ বা শুক্লধ্বজ, যিনি পরে বিজনী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন) নির্মাণ করেছিলেন।

ঐতিহাসিক হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর মতে যুবরাজ (পরে মহারাজ) শুক্লধ্বজ বা চিলারায় ফুলবাড়ি গ্রামে উঁচু মাটির পাঁচিলঘেরা এক গড় বা দুর্গে কাঠ কিংবা বাঁশের ঘরে বাস করতেন। দুর্গের ভিতরে তাঁর (চিলারায়ের) অন্দরমহল থাকায় এ স্থানের নাম হয় অন্দরান ফুলবাড়ি। সম্ভবত আদিতে অন্দরান ফুলবাড়ি গ্রামের এই দুর্গটি 'মেচাঘর'রূপে ব্যবহৃত হত (খ্রীষ্টীয় ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে কোচবিহার রাজ্যে যুদ্ধ পরিচালনার কাজে সুবিধার জন্য রাজপথের ধারে সাময়িকভাবে বাঁশ বা কাঠের ঘর নির্মাণ করা হত। এগুলিকে কোচভাষায় 'মেচাঘর' বলা হত)। আসামের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার জন্য কোচবিহাররাজ নরনারায়ণের প্রধান সেনাপতি চিলারায় তৎকালীন কোচবিহার-আসাম সড়কের পাশে, উপযুক্ত দূরত্বে, এইরকম আরও কিছু 'মেচাঘর' নির্মাণ করেন। অন্দরান ফুলবাড়ির 'মেচাঘর'টি তাঁর খুব প্রিয় ছিল। এটি রায়ডাক নদের কাছে অবস্থিত থাকায় সামরিক

দিক থেকেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। জনশ্রুতি, অন্দরান ফুলবাড়ির এই 'মেচাঘর'-এ (বা পরে রূপান্তরিত গড়ে বা কোটে) চিলারায় এক সময়ে বিখ্যাত অসমীয়া বৈষ্ণবধর্মপ্রচারক শঙ্করদেবকে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নরনারায়ণের কোপানল থেকে রক্ষা করার মানসে লুকিয়ে রাখেন। কথিত আছে যে, চিলারায় পরিণত বয়সে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। উপরের ঘটনা থেকে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া একেবারে অসঙ্গত নয় যে. সম্ভবত শঙ্করদেবের সান্নিধ্যে আসার ফলে অন্দরান ফুলবাড়িতেই চিলারায় বৈষ্ণবভাবাপন্ন হন ও পরে আনুষ্ঠানিকভাবে ওই ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। (এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে কোচরাজাদের কুলদেবতা নারায়ণ হলেও তাঁরা শাক্তধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন ও শাক্তদেবী কামতেশ্বরীর উপাসক ছিলেন; নরনারায়ণ ছিলেন একজন গোঁড়া শাক্ত।)

এই দুর্গের ঘরগুলি বাঁশ বা কাঠ দিয়ে তৈরী হয়েছিল বলে তাদের কোন চিহ্ন এখন আর দেখা যায় না। দুর্গের প্রাচীর মাটির হলেও তার ভিত সম্ভবত ইট বা চুন-মেশানো ইটের খোয়া দিয়ে শক্ত করা হয়েছিল, কেন না প্রাচীরের নীচের দিকে কিছু কিছু ইটের টুকরো দেখা যায়। দুর্গ প্রাকার স্থানে স্থানে ক্ষয়ে গেলেও এবং বর্তমান মাপ ৭ ফুট উঁচু ও ৬ ফুট চওড়া (যথাক্রমে ২'১ ও ১'৯ মিটার) হলেও, অতীতে এটি আরও উচু ও চওড়া ছিল ব'লে মনে হয়। এটি উত্তর-দক্ষিণে ২৭০ ফুট (৮৩'৭ মিটার) লম্বা ও পূর্ব-পশ্চিমে ২১০ ফুট (৬৫'১ মিটার) চওড়া ও দুর্গের ভিতরের জমির পরিমাণ প্রায় ৫৬,৭০০ বর্গফুট। দুর্গের প্রবেশপথ কোনদিকে ছিল তা সঠিকভাবে বলা যায় না; তবে মনে হয় তা পূর্বদিকে ছিল, কেন না সেদিকে পাঁচিলের মাঝামাঝি স্থানে প্রায় পাঁচ ফুট পরিমিত জায়গা খোলা পড়ে আছে। এই খোলা জায়গার আরও পশ্চিমে আর একটি পাঁচিল দেখা যায়, সেটি উত্তর-পশ্চিমের প্রাচীরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। মনে হয়, এই পাঁচিলের মাঝখানেও আর একটি পূর্বমুখী প্রবেশপথ ছিল। এটি ছিল সম্ভবত অন্দরমহলের প্রবেশপথ। আয়তাকার এই দুর্গের প্রাকারের কাছাকাছি জায়গা থেকে কিছু লোহার টুকরো পাওয়া গেছে। সেগুলি লোহার গোলার বা বলের অংশ হতে পারে; তবে উপযুক্ত পরীক্ষা ছাড়া এবিষয়ে কোন সঠিক মন্তব্য করা সঙ্গত নয়। দুর্গের সীমানার বাইরে উত্তর-পূর্ব কোণে, কয়েকটি সুন্দরভাবে কাটা

৩

পাথরখণ্ড দেখা যায়। একটি পাথরখণ্ডের গায়ে গোঁজের সুস্পষ্ট দাগও আছে। সম্ভবত এগুলির সঙ্গে দুর্গের স্থাপত্যকর্মের কোন যোগ ছিল না। কোন পাথরের মন্দির বা প্রাসাদ থেকে এগুলি আনীত হয়েছিল ব'লে মনে হয়; তবে ঠিক কি কারণে, কোথা থেকে বা কবে এগুলি সংগৃহীত হয়েছিল তা বলা যায় না। এই দুর্গের সামান্য পূর্বে সুখানী নদী ও সাড়ে চার মাইল (৭.২ কিলোমিটার) দূরে রায়ডাক নদ প্রবাহিত।

চিলারায়ের এই দুর্গ থেকে দেড় মাইল (২.৪ কিলোমিটার) দক্ষিণ-পূর্বে ও রায়ডাক নদ থেকে প্রায় আড়াই মাইল (৪ কিলোমিটার) উত্তর-পশ্চিমে কামাত ফুলবাড়ি মৌজায় আর একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এটি সাধারণের কাছে 'চিলারায়ের বড় কোট' নামে পরিচিত। এটিও প্রকাণ্ড ও প্রথমটির মত আয়তাকার এবং মাটির উঁচু প্রাকার দিয়ে ঘেরা। প্রাচীরটি প্রায় ৮ ফুট উঁচু ও ৬ ফুট চওড়া (যথাক্রমে ২.৫ ও ১.৯ মিটার)। পূর্ব-পশ্চিম বরাবর পাঁচিলটি উত্তর ও দক্ষিণের পাঁচিল থেকে লম্বায় বেশী হবে। পূর্বদিকের পাঁচিলের গায়ে প্রায় ৫ ফুট (১.৬ মিটার) পরিমিত খোলা জায়গায় গড়ের প্রবেশপথ ছিল বলে মনে হয়। প্রথম দুর্গের মত এটির পাঁচিলের ভিত্তিও ইট-চুনের মশলা দিয়ে শক্ত করা হয়েছিল। দুর্গের ভিতরের ঘরগুলি যে ইটের তৈরী ছিল, তার প্রমাণ ইতস্তত-ছড়ানো প্রচুর ইটের টুকরো। এই দুর্গটিও বাহির ও অন্দর এই দুই মহলে বিভক্ত ছিল। বাহির মহলের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের একটি স্তূপে অনেক আস্ত ইট বা টালি দেখা যায়। কাছেই এক সাধুর আশ্রমের মধ্যেও কিছু অভগ্ন ইট বা টালি সঞ্চিত আছে; সেগুলির মাপ, যথাক্রমে ৯"×৯"×২" ও ৬"×৪"×১" (যথাক্রমে, ২২.৫×২২.৫×৫ ও ১৫×১০×২.৫ সেন্টিমিটার)। কয়েকটির আকৃতি দেখে মনে হয় যে সেগুলি দেওয়াল বা ভিতের কোণে ব্যবহৃত হয়েছিল। কয়েকটির আবার আকৃতি ইংরেজী 'L' অক্ষরের মত—হয়ত সেগুলি দেওয়ালের বাঁধুনীর (বন্ধনী বা কীলক) কাজে লাগানো হয়েছিল। মাপ দেখে মনে হয়, ইটগুলি পাঠান আমলের শেষ দিকে বা মুঘল যুগের গোড়ার দিকের হতে পারে। দুর্গের স্থাপত্যরীতি, ইটের মাপ ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে এই দুর্গ দুটিকে চিলারায়ের সমসাময়িক (খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি) বলে গণ্য করা অসঙ্গত হবে না।

দ্বিতীয় দুর্গটির জমি পাশের জমি থেকে বেশ উঁচু ও এর তিনদিক দিয়ে প্রবাহিত খড়্‌খড়িয়া বা চকচকিয়া নদী দ্বারা সুরক্ষিত। কিছুকাল আগেও নাকি এই দুর্গের অনতিদূরে, রায়ডাকের তীরে, চিলারায়ের তৈরী বন্দর, শস্যাগার ও দীঘি দেখা যেত। এখন সেগুলি রায়ডাকের গর্ভে নিশ্চিহ্ন হয়েছে।

অরুণী বা আয়ীরাণী চিতলিয়া (তুফানগঞ্জ থানা) : গ্রামটি কোচবিহার শহর থেকে প্রায় ১২ মাইল (১৯ কিলোমিটার) উত্তর-পূর্বে এবং কোচবিহার-আসাম জাতীয় সড়কের প্রায় সাড়ে-চার মাইল (৭ কিলোমিটার) উত্তরে অবস্থিত। এই গ্রামের দেবালয়গুলির মধ্যে চণ্ডীঠাকুরানীর মন্দিরটি প্রসিদ্ধ। হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর মতে কোচবিহারের একজন নাজির (সম্ভবত খগেন্দ্রনারায়ণ) এই মন্দিরটি স্থাপন করেন। তখন এই গ্রামের নাম ছিল চিথলিয়া-দলবাড়ি। চণ্ডীদেবীর বর্তমান মন্দিরটি অবশ্য অত পুরানো নয়। নাজির-প্রতিষ্ঠিত মন্দিরটি সম্ভবত বহু আগেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং পরে পুরানো মন্দিরের জায়গায় বা মন্দির-চত্বরের অন্যত্র এই মন্দির পুনঃসংস্কৃত হয় বা পুনর্নির্মিত হয়। দেবালয়টির দেওয়াল ও চারচালা-চাল টিনের এবং মাটির ভিত্তিবেদী সামান্য উঁচু। প্রবেশপথ পশ্চিমদিকে। ভিতরে কাঠের সিংহাসনের উপরে ৮" (২১ সেন্টিমিটার) উঁচু একটি দ্বিভুজা ও উপবিষ্টা চণ্ডীমূর্তি ও জয়া-বিজয়ার দুটি উপবিষ্টা মূর্তি আছে। মূর্তিগুলি পিতলের বা অষ্টধাতুর। মন্দিরের টিনের চালা ও দেওয়ালের কাঠের খুঁটিগুলি খুবই জীর্ণ। একজন কামরূপদেশীয় ব্রাহ্মণ বিগ্রহগুলির পূজা করেন।

কামতাপুর দুর্গ (দিনহাটা থানা) : খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে খেনরাজ নীলধ্বজ বা নীলাম্বর নির্মিত এই দুর্গের আয়তন এত বিরাট যে কোচবিহার জেলার কয়েকটি থানার বেশ কিছু গ্রামকে এখন এর সীমানার অন্তর্ভুক্ত বলা যেতে পারে। দুর্গের কেন্দ্রস্থলে রাজপ্রাসাদ ছিল, যার অংশবিশেষ এখন রাজপাট নামে অভিহিত হয়ে দিনহাটা থানার খলিসা-গোঁসানীমারি মৌজার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রাজপাটের উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম পাশ ঘিরে প্রায় ১৪ মাইল (২২ কিলোমিটার) দীর্ঘ ঘোড়ার খুরের আকৃতির যে উঁচু মাটির পাঁচিলটি দেখা যায় তা পূর্বভারতের দুর্গগুলির মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। কামতাপুর দুর্গ পূর্বে ধরলা নদী থেকে পশ্চিমে বড় গোদাইখোড়া পর্যন্ত

ও উত্তরে শীতলাবাস থেকে দক্ষিণে শিলদুয়ার-সোয়ারীগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রাজপাটের পূর্ব দিকে ধরলা নদী প্রবাহিত থাকায় প্রায় ৫ মাইল বিস্তৃত স্থানে কোন পাঁচিলের প্রয়োজন হয় নি। দুর্গটির বাহির-পাঁচিলের ভিতরে ও বাহিরে বেশ গভীর পরিখাও ছিল। দুর্গটি সম্বন্ধে এঅঞ্চলে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। রাজা কান্তেশ্বর (কামতেশ্বর ?) বা নীলাম্বর কামতাপুর দুর্গের সুষ্ঠু নির্মাণের জন্য তাঁর উপাস্যা দেবী কামতেশ্বরীর কাছে মানত করেন যে, তিনি চারদিন উপবাসী থাকবেন। কিন্তু কোনও বিশেষ কারণে নির্দিষ্ট দিনের আগেই, তৃতীয় দিনে, তাঁকে উপবাস ভঙ্গ করতে হয় ব'লে চতুর্থ দিকের প্রাকারটি আর তৈরী হতে পারে নি। এই কিংবদন্তীর মূলে কতটা সত্য নিহিত আছে তা বলা কঠিন। সত্য ঘটনা সম্ভবত এই যে, চতুর্থ দিকে ধরলা নদী প্রবাহিত থাকায় সেদিকে প্রাচীর তৈরীর প্রয়োজন হয় নি, অথবা সুলতান হোসেন শাহের সৈন্যবাহিনীর অতর্কিত আক্রমণের জন্য সেটি শেষ করা সম্ভব হয় নি। বর্তমানে এই মাটির প্রাকার গড়ে প্রায় ৩০ ফুটের (৯.৩ মিটার) মত উঁচু (দুরিধারার কাছে ৪০ ফুট ও জগাবাড়ীর কাছে ১০ ফুট উঁচু)। নির্মাণকালে পাঁচিলটি সম্ভবত ৪০ ফুটের (১২.৪ মিটার) বেশী উঁচু ছিল। পাঁচিলটি বর্তমানে গড়ে প্রায় ৩৫ ফুট (১০.৬ মিটার) চওড়া। উনবিংশ শতকের কোন কোন প্রত্যক্ষদর্শীর মতে এটি বেশ চওড়া ছিল ও নীচের দিকে প্রস্থ ছিল প্রায় ২০০ ফুট (৬০.৬ মিটার)। দুর্গের সাতটি প্রবেশদ্বার বা দরজা ছিল, তার মধ্যে ছয়টির অস্তিত্বের নিদর্শন এখনও বর্তমান। দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে প্রবেশপথগুলির নাম যথাক্রমে, শিলদুয়ার, বাঘদুয়ার, সন্ন্যাসীদুয়ার, জয়দুয়ার, নিমাইদুয়ার ও হোকদুয়ার। এদের মধ্যে ক'টি পাথরের ও ক'টি কাঠের বা লোহার ছিল তা বলা যায় না, তবে সাক্ষ্যপ্রমাণদৃষ্টে মনে হয় যে প্রথমটি ছিল পাথরের (শিলদুয়ার নামকরণই এর বড় প্রমাণ)। এই প্রবেশপথটির ধ্বংসাবশেষ নাকি প্রায় ২০ বছর আগেও বিদ্যমান ছিল ; পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকের এক বিধ্বংসী বন্যায় তা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বাঘদুয়ারের উপরে নাকি বাঘের মূর্তি বা মুখ খোদিত ছিল। সন্ন্যাসীদুয়ার নামকরণের কারণ সম্ভবত ঐ দরজা দিয়ে সাধুসন্তেরা রাজার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। জয়দুয়ার দিয়ে রাজা বোধ হয় যুদ্ধে জিতে এসে প্রবেশ করতেন। নিমাইদুয়ার দিয়ে সম্ভবত

চৈতন্যদেব (পূর্বতন নাম নিমাই) কোচবিহারে ধর্মপ্রচারের জন্য এসেছিলেন। হোকদুয়ারের আর এক নাম ছিল হেঁকোদুয়ার। বুকানন হ্যামিলটনের মতে হেঁকো নামে একজন খেন বা কোচ নায়কের নামানুসারে হেঁকোদুয়ারের নামকরণ হয়। 'গোঁসানীমঙ্গল' পুঁথিতে এই দুর্গের উত্তরদিকে অক্ষয়দুয়ার, দক্ষিণদিকে বাঘদুয়ার ও শিলদুয়ার, পূর্বদিকে ধর্মদুয়ার ও পশ্চিমদিকে জয়দুয়ারের অবস্থিতির কথা উল্লিখিত হয়েছে। 'গোঁসানীমঙ্গল'-এ প্রবেশপথগুলির যে তালিকা দেওয়া হয়েছে, তা থেকে দেখা যায় পূর্বোক্ত তালিকার দুটি দুয়ারের উল্লেখ সেখানে করা হয় নি; আবার ঐ পুঁথিতে উল্লিখিত ধর্মদুয়ার ও অক্ষয়দুয়ারের নাম পূর্বের তালিকায় নেই। উভয় তালিকায় জয়দুয়ার, বাঘদুয়ার ও শিলদুয়ারের উল্লেখ আছে। 'গোঁসানীমঙ্গল'-এ অক্ষয়দুয়ারের অবস্থান উত্তরদিকে দেখানো হয়েছে। হেঁকোদুয়ারও উত্তরদিকে অবস্থিত ছিল। অক্ষয়দুয়ার ও হেঁকোদুয়ার অভিন্ন বলে মনে হয়। পূর্বে হয়ত এ দুয়ারটির নাম অক্ষয়দুয়ার ছিল; পরিবর্তিত নাম হয় হেঁকোদুয়ার। ধর্মদুয়ারের অবস্থান কোথায় ছিল তা বলা কঠিন, তবে মনে হয় এটির সঙ্গে পূর্বের তালিকার সন্ন্যাসীদুয়ার বা নিমাইদুয়ারের কোনও সম্পর্ক নেই; কেন না ধর্মদুয়ার পূর্বদিকে ছিল, আর উল্লিখিত ওই দুটি দুয়ার ছিল পশ্চিমদিকে। ধর্মদুয়ার নামকরণের পিছনে সম্ভবত ধর্মঠাকুর-সম্বন্ধীয় কোন কাহিনীর যোগসূত্র আছে। মধ্যযুগে বঙ্গদেশে ধর্মঠাকুরের ব্যাপক পূজা হত এবং এখনও পশ্চিমবঙ্গের উত্তরভাগে, পশ্চিমভাগে ও দক্ষিণভাগে ধর্মঠাকুরকে নানাভাবে পূজা করা হয়। সম্ভবত ধর্মদুয়ারের কাছে ধর্মঠাকুরের কোনও 'থান' ছিল, তাই থেকে দুয়ারের ওইরূপ নামকরণ হয়। বর্তমানে রাজপাটের কাছে কোন দুয়ার দেখা না গেলেও মনে হয় এখানে পূর্বে একটি প্রবেশপথ ছিল। এই প্রবেশপথের নাম কি ছিল তা বলা যায় না, তবে অনুমান জয়দুয়ার থেকে এটি পৃথক ছিল। জয়দুয়ারের অবস্থান রাজপাটের কাছে হওয়াই সঙ্গত ছিল, কিন্তু এটির বর্তমান অবস্থান রাজপাট থেকে অনেক দূরে। বর্তমানে সাতটি দুয়ারেরই কোন নির্দিষ্ট চিহ্ন দেখা যায় না, তবে স্থানে স্থানে প্রাচীরের মাঝে মাঝে যে প্রশস্ত ফাঁক দেখা যায় তা থেকে মনে হয় প্রবেশপথগুলি সেই সব স্থানেই অবস্থিত ছিল। শিলদুয়ার বাদে আর সব ক'টি প্রবেশপথের দরজা সম্ভবত লোহার বা কাঠের তৈরী ছিল। শিলদুয়ারের পাথরের দরজার কাঠামো কয়েক

বছর আগে বন্যাপ্লাবিত সিঙ্গিমারি নদীতে ভেসে যায়। বাঘদুয়ারের দু'পাশে ইটের গাঁথুনি থেকে মনে হয়, শিলদুয়ার ছাড়া বাকি ছ'টি দুয়ারের দু'পাশেই ঐরূপ ইটের গাঁথুনির গায়ে দরজা লাগানো ছিল। সমস্ত বাহির প্রাকারটি মাটির হলেও এর উপরে স্থানে স্থানে এখনও ইটের টুকরো থেকে মনে হয়, প্রাচীরের উপরিভাগ ইট দিয়ে মজবুত করা হয়েছিল। দুর্গবেষ্টনকারী পরিখাটি প্রায় ২৫০ ফুট (৭৭.৫ মিটার) চওড়া ছিল। কিন্তু এটির গভীরত্ব সম্বন্ধে এখন কিছুই বলা যায় না। গত ৫০০ বছরে এটি প্রায় বুঁজে গিয়ে অনেক স্থানে চাষের জমিতে পরিণত হয়েছে। পরিখাটিতে সব সময় জল সরবরাহ করবার জন্য 'জল-উবার' নামে একটি জলাধার নির্মাণ করা হয়েছিল। তার উত্তর দিকে ৩½ মাইল (৫.৬ কিলোমিটার) দীর্ঘ এক শাখা-প্রাচীর দেখা যায়। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ হ্যামিলটন দুর্গটি পরিদর্শন করেন ও নানা খুঁটিনাটি তথ্যসমেত একটি বিবরণী লিখে যান। তিনি আটিয়াবাড়ি-নেপ্রা গ্রামের কাছে একটি চওড়া রাজপথ ও সেতুর ভগ্নাবশেষ দেখেছিলেন। সে সেতুর আজ আর কোনও চিহ্ন নেই তবে রাস্তার ভগ্নাংশ এখনও দেখা যায়, স্থানীয় লোকের কাছে যার নাম 'মাল্লিভাঙ্গা' (মাল্লি = পথ)। এরকম আর একটি পথ 'যহর দীঘি'র কাছে দেখা যায় যেটি 'দর্পার মাল্লি' (দর্পনারায়ণ বা দর্পার পথ) নামে পরিচিত। ওই দীঘির দক্ষিণদিক দিয়ে আর একটি সড়ক ঘোড়াঘাটের (এখন বাংলাদেশে) দিকে চলে গেছে যার নাম 'নীলাম্বরী সড়ক' (খেনরাজ নীলাম্বরের তৈরী)। বাঘদুয়ার থেকে অন্য একটি রাজপথ রাজপাট অবধি বিস্তৃত ছিল। হ্যামিলটন সাহেব তার দু'ধারে অধুনালুপ্ত ইটের তৈরী ছোট ও বড় নানা প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখেছিলেন। কাছাকাছি 'ভোলানাথের দীঘি' নামে একটি আয়তাকার জলাশয় এখনও দেখা যায়। অনেকের মতে সেটি ভোলানাথ কার্যী নামে রাজা প্রাণনারায়ণের এক মন্ত্রীর দ্বারা খনিত হয়। মীরজুমলার কোচবিহার আক্রমণের সময় প্রাণনারায়ণ এই মন্ত্রীর সঙ্গে ভুটানে পালিয়ে গিয়েছিলেন। হ্যামিলটনের মতে এটি কোনও মুসলমান রাজপুরুষদ্বারা খনত, কেন না হিন্দুদের দীঘি সাধারণত চৌকো হয়, আয়তাকার হয় না। এই দীঘির উত্তর পাড়ে তিনি একটি লাল রঙের ইটের প্রাসাদ দেখেছিলেন যা, তাঁর মতে, মুরদের অনুসৃত স্থাপত্যরীতি অনুসারে নির্মিত হয়েছিল। স্থানীয় লোকে তাঁর কাছে এটিকে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের বিখ্যাত

নর্তকী লালবাঈর বাড়ী বা প্রাসাদ ব'লে উল্লেখ করেছিল। ভোলানাথের দীঘির ধাপগুলি পাথরের তৈরী। মনে হয়, সেগুলি কোন হিন্দু-মন্দিরের অংশ ছিল কেন না, এখানে দরজার কাঠামোর অংশ, থাম প্রভৃতিকে পাথরের ধাপে পরিণত করা হয়েছিল। হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর মতে এ দীঘির কাছে একটি পাথরের শিবমন্দির ছিল। পরে সেটি ভেঙ্গে ফেলে মুসলমান সেনাপতিদের আবাসে পরিণত করা হয়। ভোলানাথের দীঘি থেকে কিছু দূরে শাহ গরীব কামাল নামে একজন মুসলমান ফকিরের দরগার ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। তিনি আনুমানিক সপ্তদশ শতকের কোন এক সময়ে এখানে ধর্মপ্রচারের জন্য এসেছিলেন। এর খুব কাছেই ক্ষয়িত একটি বেলেপাথরের মূর্তি আছে। এটি 'অলটো-রিলিভো' রীতিতে গভীরভাবে খোদিত। স্থানীয় লোকে এটিকে সুবচনী দেবী হিসেবে পূজা করে থাকেন। হ্যামিলটন তাঁর বিবরণীতে এটি ও আর একটি মূর্তির কথা উল্লেখ করেছেন (মিঃ মার্টিনের 'Eastern India' পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে এই মূর্তি দুটির ছবি আছে)। অন্য মূর্তিটি কোনও বালকের বলেই মনে হয়। সুবচনী মূর্তিটিকে ভালোভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যায় সেটি হাঁটু-গেড়ে-বসা বীণাবাদনরতা এক নারীমূর্তি। মনে হয়, তার গায়ে নানা অলঙ্কার ছিল। মূর্তিটি হয় দেবী সরস্বতী বা সজ্জিতা কোন কিন্নরীর নতুবা কোন রানী বা রাজকুমারীর (খেনবংশের ?)। প্রায় ১৫০।২০০ বছর আগেও এখানে আরও কয়েকটি বেলেপাথরের মূর্তি ছিল ব'লে জনশ্রুতি। রাজপাটের উপরে এখন যেসব বেলেপাথরের মূর্তি দেখা যায়, তাদের সঙ্গে উল্লিখিত মূর্তিটির বিশেষ সাদৃশ্য আছে। মনে হয়, এই সব গভীরভাবে খোদিত বেলেপাথরের মূর্তিযুক্ত পাথরের খণ্ডগুলি কোনও মন্দির বা রাজপ্রাসাদের ভিত্তির গায়ে লাগানো ছিল। শোনা যায়, দুর্গের ভিতর থেকে কিছু স্থাপত্য-নিদর্শন (তোরণ, থাম প্রভৃতি) কোচবিহারের রাজপ্রাসাদে বা অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দুর্গের ভিতরে রাজপাটের ঢিবি, টাঁকশালের ধ্বংসাবশেষ, রাজাদের স্নান করবার জন্য গ্রানিট পাথরের বিরাট একটি চৌবাচ্চা, ভুলকাভুলকি নামে একটি আজব প্রাসাদ, রাস্তার চিহ্ন, বড় বড় মজা দীঘি আর পাথরের কিছু মূর্তি ও থাম প্রভৃতির ভাঙ্গা অংশ দেখা যায়। এখন টাঁকশালে কারুকার্যখচিত কয়েকটি থাম, পাথরের খণ্ড ও কীর্তিমুখ ছাড়া অন্য কিছু অবশিষ্ট নেই। জায়গাটির নাম টাঁকশাল হল কেন তা বলা কঠিন, কেন না এই পাথরের খণ্ডগুলিকে কোন রাজপ্রাসাদ বা মন্দিরের

অংশ বলেই মনে হয়। জনশ্রুতি, এখানে খেনরাজাদের একটি টাকশাল ছিল কিন্তু তাঁদের বা অন্য রাজাদের কোন টাকা এখান থেকে পাওয়া যায় নি। তবে মাটির তলায় কি আছে বলা শক্ত। রাজপাট থেকে টাঁকশালের দূরত্ব আধমাইলের বেশী হবে না।

'রাজপাট' বা রাজপ্রাসাদটি দুর্গের প্রায় মাঝখানেই ছিল, কিন্তু এখন এক বিরাট ঢিবির উপরে কিছু পাথরের খণ্ড ও মূর্তি ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। ঢিবিটি চারকোণা ও প্রায় ৪০ ফুট (১২·৪ মিটার) উঁচু। হ্যামিলটনের সময় ঢিবিটি উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ১৮৮০ ফুট (৫৮২ মিটার) ও পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ১৮৬০ ফুট (৫৭৭ মিটার) বিস্তৃত ছিল এবং সেটিকে ঘিরে প্রায় ৬০ ফুট (১৯ মিটার) গভীর একটি পরিখা ছিল। পরিখাটি এখন প্রায় বুঁজে গেছে। এ দুর্গে বর্তমানে দেখবার বিশেষ কিছুই নেই। তবে হ্যামিলটনের সময় দুর্গপ্রাকার ছিল দুটি; বাইরেরটি মাটির ও ভিতরেরটি ইটের। হ্যামিলটনের মতে দুর্গের আরও ভিতরে ছিল আর একটি ইটের বেষ্টনী যার মধ্যে হয়ত ছিল রাজার অন্তঃপুর। এর বাইরে মাটির পাঁচিলঘেরা এক অংশে রাজকর্মচারীরা বাস করতেন ব'লে মনে হয়। রাজপাটের ঢিবির উপর অনেক জায়গায় কিছু কিছু ইট ও পাথর পড়ে আছে; সেগুলি (থামের অংশ প্রভৃতি) কোন রাজপ্রাসাদের বা মন্দিরের অংশ ছিল বলেই মনে হয়। এখানে কখনও কোন প্রাসাদ ছিল কিনা সে বিষয়ে মতান্তর আছে। হ্যামিলটন ও হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর মতে, কামতেশ্বরী দেবীর আদি মন্দিরটি এখানেই অবস্থিত ছিল। হ্যামিলটন সাহেব এসব ইমারতি নিদর্শনাদি ছাড়াও আরও কিছু ইটের প্রাসাদ ও পূজার স্থান বা প্রাঙ্গণ দেখেছিলেন যা এখন লুপ্ত। রাজপাট ও তার চারপাশে খননকার্য চালালে অনেক কিছু পুরাবস্তু ও পুরাকীর্তি আবিষ্কৃত হতে পারে। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ রাজপাটের ঢিবি থেকে যে বিষ্ণুমূর্তিটি পাওয়া যায়, সেটি এখন বর্তমানের কামতেশ্বরী মন্দিরে আছে। কামতাপুর দুর্গটি হোসেন শাহের আক্রমণে বিনষ্ট হয়ে যায়।

আগেই বলা হয়েছে যে রাজপাটের ঢিবির উপরে কয়েকটি 'অলটো-রিলিভো' রীতিতে গভীরভাবে খোদিত মূর্তি একত্র দেখা যায়। মূর্তিগুলির শিল্পকর্ম খুব একটা উঁচু মানের নয়। এগুলির নির্মাণকাল সেনযুগের কিছু পরের অথবা খেন আমলের হতে পারে। এগুলির নির্মাণ-শৈলীতে অহোম বা মন-খ্মের ভাস্কর্যের কিছুটা মিল হয়ত

থাকলেও থাকতে পারে। খেনরা যদিও নিজেদের কায়স্থ বলে দাবী করতেন, তবু একথা বোধ হয় অস্বীকার করা যায় না যে তাঁরা ইন্দো-মোঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর বোড়ো উপ-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অদ্যাবধি রক্ষিত মূর্তিগুলির (দেবতাদের ও নরনারীর) মুখ একটু লম্বা ধরনের এবং দেহের গঠন একটু লম্বা ও পাতলা ধরনের হওয়ার জন্য এগুলি অহোম বা মন-খ্মেরদের মুখ ও আকৃতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মূর্তিগুলির সাজসজ্জাও একটু বিচিত্র ধরনের। রাজা বা রানীদের মাথায় একটু চোখা বা কোণাকৃতি শিরোভূষণ আছে। একটি মূর্তিতে আবার এক রাজাকে (অথবা মন্ত্রী বা বড় রাজকর্মচারীকে) চোগা ও দোপাট্টা প'রে থাকতে দেখা যায়। খেনযুগে সৈনিকের কিরূপ চেহারা ও বেশভূষা ছিল তা আমরা একটি পাথরের খণ্ডে খোদিত দুটি সৈনিকের মূর্তি থেকে জানতে পারি। তারা বর্ম বা বেশ আঁটসাঁট পোষাক প'রে হাতে তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের শিরস্ত্রাণ গোল, চোখা এবং একটু লম্বা ধরনের। খেনরাজাদের উপাস্য দেবতা সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা কঠিন, তবে মনে হয় তাঁরা শক্তির উপাসনাই করতেন। কিংবদন্তী, তাঁদের উপাসিতা দেবী ছিলেন কামতেশ্বরী। রাজপাটের ঢিবির উপরে কয়েকটি গৌরীপট্টও দেখা যায়। আদিতে এদের সঙ্গে শিবলিঙ্গও নিশ্চয় ছিল। বাণেশ্বর মন্দিরের নির্মাতা হিসাবে খেনরাজাদের নামও শোনা যায়। শিবলিঙ্গসমেত গৌরীপট্টগুলি যদি খেনযুগের 'পরের না হয় আর বাণেশ্বরের আদি মন্দির যদি খেনরাজাদের দ্বারা নির্মিত হয়ে থাকে তবে খেনরাজাদের সময়ে শিবও হয়ত পূজিত হতেন। খেনরাজাদের সময়ে কোচবিহারে বা কামতায় বৈষ্ণবধর্ম বা কৃষ্ণপূজা সম্ভবত জনপ্রিয় ছিল—তার প্রমাণ পাওয়া যায় এখানকার কয়েকটি মূর্তি থেকে। একটি মূর্তিতে কৃষ্ণ ও একটি নাগিনীকে দেখানো হয়েছে। সম্ভবত এটি কালীয়দমনের পর নাগপত্নী কর্তৃক কৃষ্ণস্তুতির আখ্যানকে রূপায়িত করেছে। আর একটি মূর্তিতে বালক কৃষ্ণকে গোপীদের সঙ্গে লীলা করতে দেখা যায়। একজন গোপীর হাতে দধিভাণ্ড থাকায় এটিকে ভাগবতোক্ত 'ভারখণ্ড'এর কোনও দৃশ্যের রূপায়ণ বলে অনুমান করা যেতে পারে। সে যুগে বৈষ্ণবধর্ম বা কৃষ্ণপূজা খুব ব্যাপক না হলেও কৃষ্ণলীলা বা কৃষ্ণায়ণ এখানে বেশ জনপ্রিয় ছিল বলেই ধারণা হয়। খেনরাজাদের চক্রধ্বজ ও নীলাম্বর নাম বিষ্ণু বা কৃষ্ণের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তা ছাড়া পালযুগের একটি বিষ্ণুমূর্তিও এখান থেকে পাওয়া গেছে।

রাজপাটের ঢিবির উপর মোট নয়টি (দুটি বেশ ক্ষয়িত ও অস্পষ্ট) মূর্তিফলক দেখা যায়। এদের মধ্যে কয়েকটিকে হ্যামিলটন সাহেব হয়ত আদাবাড়ির কাছে দেখেছিলেন। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সমীক্ষার মহা-অধিকর্তা স্বর্গত মাধোস্বরূপ বৎসও (১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ বা তার আগে) এই মূর্তিগুলি ও রাজপাটের ঢিবিটি প্রদর্শন করেন ও সে সম্পর্কে তাঁর একটি বিবরণীও কোচবিহার জেলার সেন্সাস হ্যাণ্ডবুক' (১৯৫১)-এ মুদ্রিত হয়। মূর্তিগুলির বিবরণ (দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে) নিম্নরূপ:

(১) উপাসনা বা পূজারত অবস্থায় সম্ভবত এক রাজদম্পতি। যুগলমূর্তিটি উপাসনার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে। মূর্তি দুটির মাথায় তিন-কোণা চোখা মুকুট ও অন্যান্য রাজজনোচিত সাজসজ্জা।

(২) বামন (রাজকর্মচারী ?) ও রাজা—রাজা যথারীতি সুসজ্জিত। রাজা ও বামনের সম্মিলিত মূর্তির রূপায়ণ প্রাচীন ভারতে সুপ্রচলিত ছিল। প্রসঙ্গক্রমে, আমরা গুপ্তসম্রাটদের কিছু মুদ্রায় রাজা ও বামনের প্রতিকৃতির উল্লেখ করতে পারি।

(৩) রাজদম্পতি—সিংসাসন, তিনকোণা মুকুট ও অন্যান্য সাজ-সজ্জা থেকে বোঝা যায় পুরুষমূর্তিটি রাজার ও নারীমূর্তিটি রানীর। চৌকির মত সিংহাসনে রাজা ব'সে আছেন আর তার পাশে রানী দাঁড়িয়ে আছেন।

(৪) রাজা বা মন্ত্রী ও তাঁর কর্মচারী বা ভৃত্য—প্রধান পুরুষ-মূর্তিটির পরনে চোগা ও গলায় দোপাট্টা।

(৫) দু'জন সশস্ত্র সৈনিক বা রাজপ্রহরী—মাথায় গোল, চোখা ও লম্বা শিরস্ত্রাণ প'রে তলোয়ার হাতে নিয়ে তাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন।

(৬) কৃষ্ণ ও নাগিনী—পুরুষমূর্তিটির মাথায় উচুকিরীটী মুকুট আর সালংকৃতা নারীমূর্তিটি জোড় হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। মাথায় সর্পছত্র ও দেহের নীচের অংশে সর্পকুণ্ডলী থাকায় নারীমূর্তিটি যে কোনও নাগিনীর সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। এ ভাস্কর্যটিতে কোন নাগপত্নী-কর্তৃক কৃষ্ণস্তুতির আখ্যানই মূর্ত হয়ে উঠেছে মনে হয়।

(৭) গোপীরমণ কৃষ্ণ—এটিতে মোহনচূড়া মাথায় ও নানা অলঙ্কারে ভূষিত বালক কৃষ্ণকে সুসজ্জিতা দুইজন গোপীর সঙ্গে লীলারত অবস্থায় দেখা যায়। বালক কৃষ্ণের পরনে চোগা ও গোপীদের পরনে শাড়ি বা ঘাগরা। গোপী দু'জন তাঁদের এক হাত দিয়ে দই-এর ভাঁড় কৃষ্ণের নাগালের বাইরে তুলে ধ'রে আছেন আর অন্য হাতে কৃষ্ণকে

বাতাস করছেন। এ ভাস্কর্যটি ভাগবতের 'ভারলীলা' বা 'দানলীলা'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই মূর্তিগুলির মাপ গড়ে প্রায় ৩'২" × ২'৪" (৯৮ × ৭২ সেন্টিমিটার)।

কোচবিহার শহর : পূর্বতন কোচবিহার রাজ্যের রাজধানী এবং অধুনা কোচবিহারের জেলা-সদর এ শহরটি তোর্সা নদীর তীরে অবস্থিত। মহারাজ বিশ্বসিংহের রাজধানী বর্তমান কোচবিহার শহর-সীমানার মধ্যে না হলেও কাছাকাছি কোথাও অবস্থিত ছিল। মহারাজ রূপনারায়ণের সময়ে গুড়িয়াহাটি (বর্তমান কোচবিহার শহরের পূর্ব নাম) কোচবিহার রাজ্যের রাজধানী ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কোচ-রাজাদের রাজধানী বিভিন্ন সময়ে অবস্থিত ছিল বিভিন্ন স্থানে। মহারাজ বিশ্বসিংহের সময়ে ও তার পরে এ রাজ্যের রাজধানী ছিল—চিকনা, হিঙ্গুলাবাস বা হিঙ্গুলাকোট, ভ্রমরাকুণ্ড, কোচবিহার, আঠারোকোঠা, গুড়িয়াহাটি, তোর্সার পাড়, বসন্তপুর, ধলিয়াবাড়ি, ভেটাগুড়ি প্রভৃতি স্থানে। কোচবিহার শহরটি বেশ সুপরিকল্পিত। এখানে বহু মনোহর অট্টালিকা, রাজপথ, দীঘি ও মন্দির আছে। সাগরদীঘি নামে বৃহৎ জলাশয়টির কাছে কোচবিহার-নৃপতিদের রাজপ্রাসাদটি খুবই সুন্দর। এটি ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের সময়ে নির্মিত। ইটের তৈরী চু'রঙা এই হর্ম্যে তৎকালীন ইউরোপীয় স্থাপত্যের যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। ইমারতটির চূড়ায় একটি বিরাট আকৃতির ধাতু-নির্মিত গম্বুজ আছে। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে কোচবিহারের পুরাতন রাজ-প্রাসাদটি ধ্বংস হয়ে যায়। যে অঞ্চলে এই রাজপ্রাসাদটি ছিল তা সাধারণের কাছে পুরানাবাস ব'লে পরিচিত। শহরে যেসব মন্দির আছে সেগুলি খুব পুরাতন নয়, কেন না তাদের বেশীর ভাগই মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বা সংস্কৃত। এসব মন্দিরের অধিকাংশই সাগরদীঘি, বৈরাগীদীঘি ও পুরানাবাসের কাছে অবস্থিত। এছাড়া এখানে একটি পুরাতন মসজিদ, একটি ব্রাহ্মমন্দির, তুটি জৈনমন্দির ও একটি গির্জাও আছে।

অনাথনাথ শিবের মন্দিরটি শহরের সুভাষপল্লী অঞ্চলে অবস্থিত। এর প্রায় সামনেই, রাস্তার উপরে, পুরানী মসজিদ ও পাশে শনি-ঠাকুরের দোতলা মন্দিরটি দেখা যায়। মন্দিরটি পাকা; দেওয়াল চুনবালির প্রলেপে আবৃত। কোচবিহারের অধিকাংশ মন্দিরের মত এটিও চারকোণা এবং এর বাঁকানো চালের কেন্দ্রে একটি গম্বুজ

স্থাপিত। গম্বুজের উপর যথারীতি পর পর পদ্ম, আমলক ও ত্রিশূল আছে। মন্দিরে কোন প্রতিষ্ঠাফলক নেই, তবে শোনা যায়, মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণের (খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতকের তৃতীয় পাদে) রানী নিশিময়ী দেবী এটি নির্মাণ করেন। স্থাপত্যের বিচারে এই জনশ্রুতি ঠিক বলেই মনে হয়। সামান্য উঁচু ভিত্তিবেদীর উপরে দেবালয়টি প্রতিষ্ঠিত এবং মাটি থেকে উচ্চতায় প্রায় ২৮ ফুটের (৮·৭ মিটার) মত হবে। দক্ষিণমুখী এ দেবগৃহের গায়ে চুনবালির তৈরী দুটি বিড়ালমূর্তি, একটি গণেশমূর্তি, দুটি সিংহমূর্তি ও পদ্মের অলংকরণ আছে। মন্দিরের দেওয়ালে বহু খাজকাটা খোপ আছে, কিন্তু সেখানে কোন পোড়ামাটির অলংকরণ নেই। দেবালয়টির পূর্ব ও পশ্চিম দেওয়ালে একটি করে নকল জানালা ও সেগুলির দুপাশে দুটি করে গোল থাম আছে। মন্দিরের ছাদের চারকোণে চারটি গোল থাম দেখা যায়। শ্রীঅম্রীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এগুলি মুসলিম-স্থাপত্যের মিনারের অনুকরণে নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরের দেওয়ালে বিড়ালমূর্তির অভিনবত্ব সম্বন্ধে কিংবদন্তী এই যে, রানী নিশিময়ী দেবী বিড়ালবধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এভাবে বিড়ালমূর্তি স্থাপন করান।

মন্দিরটি মোটামুটি ভাল অবস্থাতেই আছে। কোচবিহার দেবোত্তর সংস্থার পরিচালনাধীন এ দেবালয়ে নিত্যপূজা চালানোর জন্য একজন মৈথিলী ব্রাহ্মণ পূজারী হিসাবে নিযুক্ত আছেন।

মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণের (১৮৩৯-১৮৪৭ খ্রীঃ) বড় রানী কামেশ্বরী দেবী বা ডাঙ্গর আয়ী (ডাঙ্গর=বড়; আয়ী=রানী)-কর্তৃক ডাঙ্গরআয়ী মন্দিরটি নির্মিত হয়। প্রধান বিগ্রহ দুর্গা হলেও এটিতে অন্যান্য দেবদেবীও পূজিত হন। সমতল ছাদবিশিষ্ট এই একতলা পাকা মন্দিরটিকে দালান-মন্দির বলা যেতে পারে। একতলার চারটি ঘরে কালী, দুর্গা, শিব, নারায়ণ ও রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতির মূর্তি রক্ষিত আছে। কালী, দুর্গা ও রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি অষ্টধাতুনির্মিত এবং শিব ও নারায়ণমূর্তি পাথরের। এছাড়া মদনমোহনের একটি অষ্টধাতুর বিগ্রহও ছিল—সেটি চুরি হয়ে গিয়েছে। সব বিগ্রহেরই নিত্যপূজা হয় এবং সেজন্য পূজারী নির্দিষ্ট আছে। মন্দিরটির বিস্তৃত প্রাঙ্গণ উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রাঙ্গণে প্রবেশদ্বারের উপরের নহবৎখানার ছাদ হাতির পিঠের মত ও তার উপরে, কিছু ব্যবধানে, তিনটি রত্ন আছে। মন্দিরের

প্রবেশদ্বারের কিছু উপরে যে প্রতিষ্ঠাফলক আছে তার ভাষা সংস্কৃত, কিন্তু হরফ বাংলা। সেটির পাঠ নিম্নরূপ :

প্রাসাদং শরশূন্যহস্তিধরণৌ সকা অম্বিকে (?)।
সংনির্মায় শিবেন্দ্রভূপমহিষী শ্রীশ্রীল কামেশ্বরী ॥
দুর্গাভক্তিযুতোত্তরায়ণ সমাখ্যানে রবেঃ সংক্রমে।
পৌষে ত্রিংশমিতে দিনে স্ম কুরুতে তস্য প্রতিষ্ঠাবিধিঃ ॥
১২৯০ সাল ॥

এ লিপি থেকে জানা যায়, মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণের রানী কামেশ্বরী দেবী দুর্গার প্রতি ভক্তি-অর্ঘ্যস্বরূপ ১৮০৫ শকাব্দ বা ১২৯০ বাংলা সনের উত্তরায়ণ সংক্রান্তি (১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী) অর্থাৎ ৩০শে পৌষ তারিখে এই প্রাসাদ বা মন্দির নির্মাণ করে সেখানে দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। এ দেবালয়কে গুঞ্জাবাড়িও বলা হয়, কেন না এখানে মদনমোহনের 'মাসার বাড়ি' অবস্থিত। আগে রথযাত্রার সময় মদনমোহন বিগ্রহকে এখানে আনা হত ও পুনর্যাত্রা অবধি রাখা হত। এখন রাসযাত্রা উপলক্ষে রাজমাতা ঠাকুরবাড়ি ও ডাঙ্গরআয়ী ঠাকুরবাড়ি থেকে রাধাকৃষ্ণ, অনন্তশিলা এবং নারায়ণশিলা প্রভৃতি বিগ্রহকে মদনমোহন ঠাকুরবাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। কোচবিহার দেবোত্তর সংস্থার কর্তৃত্বাধীনে হলেও ডাঙ্গরআয়ী মন্দিরটির বর্তমান অবস্থা ভাল নয়।

বড়দেবীমন্দির বা দেবীবাড়ি নামে পরিচিত দেবালয়টি 'দেবীবাড়ি পল্লী'তে অবস্থিত। কোচবিহারে দেবী দুর্গা বা ভবানীকে বড়দেবী বলা হয়। উভয় বাংলায় দুর্গাকে যেমন লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশ সমভিব্যাহারে দেখানো হয়, এখানে কিন্তু দুর্গা বা বড়দেবী একাকিনীই পূজিতা। তিনি দশভুজা, সিংহ ও ব্যাঘ্রবাহনা এবং অসুরের সঙ্গে যুদ্ধরতা। প্রতি বছর শারদীয়া দুর্গাপূজার সময় দেবীর মাটির মূর্তি গড়ে এক পশ্চিমমুখী উঁচু ও স্থায়ী মণ্ডপের উপর স্থাপন করা হয়। মণ্ডপের বাইরের দিকে আটটি 'করিন্থিয়ান' থাম থাকায় উনিশ শতকের ইউরোপীয় স্থাপত্যের কিছু প্রভাব এর উপরে পড়েছে বলে মনে হয়। মণ্ডপের উপরে একটি বড় গম্বুজ আছে। ছাদের কার্নিসের নীচে 'পেডিমেন্ট'-জাতীয় একটি তিনকোণা অলংকরণ দেখা যায়। গম্বুজের চারপাশের সমতল ছাদ লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা। রেলিং-এর মাঝে মাঝে মিনারের মত গম্বুজশীর্ষ সরু ও লম্বা থাম আছে। সামান্য

উচ্চতার ব্যবধানে, ছাদের উপর এরকম আরও দুই সারি রেলিং আছে। এই মণ্ডপযুক্ত দেবালয়ের কে নির্মাতা তা জানা যায় না; তবে এটি খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতকে প্রতিষ্ঠিত বলে মনে হয়। দুর্গা বা ভবানী কোচবিহারের রাজাদের কুলদেবতা ও শারদীয়া দুর্গাপূজা কোচবিহারের রাজাদের পারিবারিক পূজা। কোচবিহারে দুর্গাপূজার প্রথম প্রচলন কে করেন তা বলা শক্ত, তবে মনে হয় মহারাজ নরনারায়ণই এর প্রবর্তক। জনশ্রুতি এই যে, শুক্লধ্বজ একবার তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নরনারায়ণকে হত্যার চেষ্টা করেন; তখন কুলদেবী দুর্গা দশভুজা হয়ে রাজাকে রক্ষা করেন। তারপর থেকে নরনারায়ণ দেবীর পূজা আরম্ভ করেন। বাৎসরিক পূজার সময় মহিষ, শূকর ও ছাগ বলি দেওয়া হয় এবং এই উপলক্ষে একটি বিরাট মেলা বসে। এই মণ্ডপযুক্ত দেবালয়টি কোচবিহারের দেবোত্তর সংস্থার অধীন।

মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণকর্তৃক ১৮৮৯-৯০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত বর্তমান মদনমোহন মন্দিরটি বৈরাগীদীঘির উত্তর তীরে অবস্থিত। কোচবিহারের অধিকাংশ মন্দিরের মত এটিও বাংলা চারচালার অনুকরণে চারকোণা ঘরের বাঁকানো কার্নিসের উপর গম্বুজ বসিয়ে নির্মিত। তবে এখানে পাশাপাশি চারটি ঘর থাকায় এটিতে দালান-মন্দিরের প্রভাবও কিছুটা পড়েছে। মদনমোহনের ঘরটির উপরই সোনালী রঙের গম্বুজটি স্থাপিত। তার উপরে যথারীতি পদ্ম, কলস, আমলক প্রভৃতি আছে। মন্দিরটির সামনে আছে সমতল ছাদের এক বারান্দা। মন্দিরের চারটি ঘরে বহু দেবদেবীর মূর্তি আছে। মদনমোহনের ঘরটিই এদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। সেখানে মদনমোহনের কষ্টিপাথরের তিনটি মূর্তি আছে—বড়টি ২'৬" (৭৮ সেন্টিমিটার) ও অন্য দুটি ১'৬" (৪৭ সেন্টিমিটার) উঁচু। বড় মূর্তিটি এক রূপার সিংহাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত। এছাড়া এ ঘরে পাটদেবতী বা দুর্গা, রাধাকৃষ্ণ ও নারায়ণশিলাও আছেন। এর ডানপাশের ঘরে শ্বেতপাথরের শায়িত মহাকালমূর্তির উপর কষ্টিপাথরের এক কালীমূর্তি দেখা যায়। মূর্তিটি প্রায় ২ ফুট (৬২ সেন্টিমিটার) উঁচু। বামপাশের ঘরে অষ্টধাতুর জয়তারা, অন্নপূর্ণা, কাত্যায়নী ও মঙ্গলচণ্ডীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। এগুলি ৮" (২১ সেন্টিমিটার) থেকে ১' (৩১ সেন্টিমিটার) অবধি উঁচু। বিস্তৃত মন্দিরপ্রাঙ্গণে ভবানীদেবী ও আনন্দময়ী কালীর মন্দিরও আছে। উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এই মন্দিরপ্রাঙ্গণের প্রবেশ-দ্বার দক্ষিণদিকে। তার উপরে এক নহবৎখানা আছে। কোচবিহার

দেবোত্তর সংস্থার তত্ত্বাবধানে এ মন্দিরগুলিতে রক্ষিত যাবতীয় দেবদেবীর নিত্যসেবা হয়ে থাকে। দুর্গাপূজা, রথযাত্রা, রাস ও দোলের সময় এখানে বিশেষ পূজা ও উৎসব হয়। রাসের সময় এখানে এক মেলা বসে। মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ-প্রবর্তিত এখানকার রাস-উৎসব উত্তর-বঙ্গের লোক-উৎসবগুলির মধ্যে বৃহত্তম বললে অত্যুক্তি হয় না।

মদনমোহন কিভাবে ও কোন্ সময়ে কোচবিহারের রাজাদের কুলদেবতাতে পরিণত হন তা অজ্ঞাত; তবে জনশ্রুতি, মহারাজ নরনারায়ণ এই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমান ঐতিহাসিকদের মতে, কোচরাজাদের কুলদেবতা ছিলেন নারায়ণ। 'রাজবংশাবলী' ও 'বুরুঞ্জী'-জাতীয় পুস্তকে মদনমোহন বিগ্রহের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা সম্বন্ধে মতানৈক্য আছে। অনেকে প্রাণনারায়ণকে এর প্রতিষ্ঠাতারূপে বর্ণনা করলেও নানা সাক্ষ্যপ্রমাণে মনে হয় যে মহারাজ রূপনারায়ণই ছিলেন এর প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। রূপনারায়ণ-নির্মিত মন্দিরটি সম্ভবত পুরানাবাসে ছিল। পরে সেটি ধ্বংস হয়ে গেলে মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ বৈরাগী-দীঘির উত্তর পাড়ে বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করেন। রাসপূর্ণিমার সময় প্রায় দশদিন ধরে এখানে এক বিরাট উৎসব ও মেলা বসে। এই তিথিতে কোচবিহারের রাজারা নূতন রাজপ্রাসাদে 'গৃহপ্রবেশ' করেন ব'লে এই উৎসব রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় জাতীয় উৎসব হিসাবে পালিত হয়। এসময়ে মদনমোহনকে মন্দিরের সামনের বারান্দায় বিশেষভাবে সজ্জিত একটি মঞ্চে স্থাপন করা হয় ও ডাঙ্গরআয়ী এবং রাজমাতা-ঠাকুরবাড়ি থেকে রাধাকৃষ্ণ, অনন্তশিলা ও নারায়ণশিলাকে মদনমোহন মন্দিরে আনা হয়। এখানকার সব ক'টি মন্দির ভাল অবস্থাতেই আছে। কোচবিহার দেবোত্তর সংস্থা প্রয়োজনীয় কর্মচারীর সাহায্যে বিগ্রহ-গুলির দেখাশোনা ও নিত্যপূজার ব্যবস্থা করে থাকেন।

ভবানীদেবীর দক্ষিণমুখী মন্দিরটি মদনমোহন মন্দিরের পূর্বদিকে অবস্থিত। দেবালয়টি ইটের ও চারচালার উপরে গম্বুজসজ্জিত। গম্বুজের উপরে যথারীতি পদ্ম, আমলক ও কলস পর পর স্থাপিত আছে। নীচু ভিত্তিবেদীসমেত দেবালয়টির উচ্চতা প্রায় ২৮ ফুট (৮·৭ মিটার)। মন্দিরের ভিতরে রূপার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিতা ভবানীদেবীর লাল রঙের প্রায় ২'৬" (৭৮ সেন্টিমিটার) উঁচু একটি মাটির মূর্তি আছে। মূর্তিটি মহিষাসুরমর্দিনীর অনুরূপ এবং বড়দেবীর মত লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশ এখানেও অনুপস্থিত। তবে দেবীর দুই সখী—বামে জয়া ও

দক্ষিণে বিজয়া—এখানে উপস্থিত আছেন। দেবী দশভূজা হয়ে বামে সিংহ ও দক্ষিণে ব্যাঘ্রের উপর দাঁড়িয়ে অসুরকে বিনাশরতা। দুর্গার বাহনরূপে ব্যাঘ্রের ব্যবহার আর কোথাও দেখা যায় না। অনেকের মতে কবচরূপিণী কামতেশ্বরী দেবীর আসল আকৃতি এই দশভূজা মূর্তিরই অনুরূপ। প্রসঙ্গত, মহারাজ প্রাণনারায়ণ-নির্মিত কামতেশ্বরী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাফলকে অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে ভবানী নামে অভিহিত করার কথা বলা যায়। বর্তমান ভবানী মন্দিরে দেবীর মৃন্ময়ী মূর্তির নীচে কষ্টি-পাথরের সিংহবাহনা দশভূজা ভবানী বা দুর্গার একটি ছোট মূর্তিও (উচ্চতা প্রায় ৪′ বা ১০·৪ সেন্টিমিটার) দেখা যায়। এই মূর্তিটি প্রাচীন বলে মনে হয়। এখানে মহাকালের একটি প্রতীক মূর্তিও আছে। দুর্গাপূজার সময়ে মহা-আড়ম্বরে ভবানীদেবীর পূজা হয়। মন্দিরের বাহিরে প্রবেশদ্বারের পাশে দুটি ছোট গোল থাম ও উপরে তিনটি বহুমুখী খিলান আছে। দেবালয়টি সম্ভবত মহারাজ হরেন্দ্র-নারায়ণকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং বর্তমানে ভাল অবস্থাতেই আছে। এটি ও আনন্দময়ী কালীমন্দিরটি কোচবিহার দেবোত্তর সংস্থার পরিচালনাধীন।

রাজমাতা ঠাকুরবাড়িটি পুরানাগ্লাসের খুব কাছেই অবস্থিত। মন্দিরে রাধারমণ বা রাধাবিনোদ পূজিত হলেও, এটি রাজমাতাকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দরুন রাজমাতা ঠাকুরবাড়ি নামেই পরিচিত। কোচবিহারে দু'জন রাজমাতা খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেন—একজন মহারাজ হরেন্দ্র-নারায়ণের মাতা ও অন্যজন মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণের মাতা। মনে হয়, ভাজরআয়ী কামেশ্বরী দেবী (নৃপেন্দ্রনারায়ণের মাতা) ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্বে এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। দালান-মন্দিরের মত হলেও গর্ভগৃহের উপরে গম্বুজ থাকায় এটিকে ঠিক দালান-মন্দির বলা চলে না। গর্ভগৃহের সামনে সমতল ছাদের বারান্দা আছে। মন্দিরের বহুমুখী খিলানযুক্ত প্রবেশপথটি দক্ষিণদিকে অবস্থিত। গর্ভগৃহের ভিতরে একটি সিংহাসনের উপরে রাধারমণ বা রাধাবিনোদমূর্তি স্থাপিত। কোচবিহার দেবোত্তর বিভাগের পরিচালনায় বিগ্রহের নিত্যপূজা ও ভোগ হয়।

ইটের তৈরী ও ভিত্তিবেদীহীন হিরণ্যগর্ভ শিবমন্দিরটি সাগরদীঘির পূর্ব তীরে অবস্থিত ও প্রায় ২২ ফুট (৭ মিটার) উঁচু ও দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১২ ফুট (৩·৭ মিটার)। চারচালা ধরনে নির্মিত দেবালয়টির উপরে

গোলার্ধাকার গম্বুজ আছে। গম্বুজের উপরে যথারীতি, পর পর, পদ্ম, পলকাটা বা নলাকৃতি আমলক, কলস ও ত্রিশূল আছে। দেবালয়টির পূর্বদিকের প্রবেশপথটিই প্রধান; পশ্চিমদিকেও আর একটি দরজা আছে। উত্তর ও দক্ষিণের দেওয়ালে একটি করে নকল দরজা আছে। প্রত্যেক দিকে দরজার দুপাশে দুটি করে নকল জানালাও দেখা যায়। মন্দিরের চার কোণেই বাঁকানো কার্নিসের নীচের অংশ খাঁজকাটা। পূর্বদিকের দরজার কিছু উপরে, দেওয়ালের গায়ে, একটি পাথরের প্রতিষ্ঠাফলক নিবদ্ধ আছে। তার ভাষা প্রধানত সংস্কৃত, কিন্তু হরফ বাংলা। শিলালিপিটির পাঠ এইরূপ:

গ্রহাক্ষিমৈত্রপ্রমিতে শকাব্দে
বিহাররাজ্যাধিপতির্নরেন্দ্রঃ।
শ্রীশ্রীহরেন্দ্রো শিববংশজাতো
বিনির্ম্মমে মন্দিরমেনমেশং॥
১২২৯ শকাব্দে
মহারাজ শ্রীল শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের
অনুজ্ঞায় নির্মিত

এই শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, বিহার রাজ্যের (কোচবিহার রাজ্য সময়ে সময়ে বিহার বা বেহার রাজ্য বলে অভিহিত হত) শিববংশীয় রাজা হরেন্দ্র (নারায়ণ) কর্তৃক ঈশ বা ভগবান শিবের এই মন্দিরটি ১২২৯ শকাব্দে (অবশ্যই বঙ্গাব্দ বা সন হবে) নির্মিত হয়েছিল। সেকালের রীতি অনুযায়ী কথায় ও অঙ্কে দু'ভাবেই লিপির তারিখ দেওয়া হয়েছে। ১২২৯ সন ইংরাজী ১৮২২-২৩ খ্রীষ্টাব্দের সমসাময়িক। হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী কিন্তু মনে করেন যে মন্দিরটি ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। তিনি সম্ভবত ১২২৯ শকাব্দকে ১৭২৯ শকাব্দ ব'লে ধরেছিলেন। তাঁর পাঠ শুদ্ধ হলে, তাঁর অনুমানই হয়ত ঠিক।

এখানে হিরণ্যগর্ভশিব নামে পরিচিত একটি বড় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁর নিত্যপূজা ছাড়াও শিবরাত্রি উপলক্ষে বিশেষ পূজা হয়। মন্দিরটি কোচবিহার দেবোত্তর সংস্থার অধীনে ভাল অবস্থাতেই আছে।

অনার্থনাথ শিবমন্দিরের প্রায় বিপরীত দিকে যে মসজিদটি দেখা যায়, লোকে তাকে পুরানী মসজিদ বলে। এটি প্রায় দু'শ বছরের পুরানো ও বর্তমানে ভাল অবস্থাতেই আছে। প্রাকারবেষ্টিত এ মসজিদের

প্রবেশদ্বার দক্ষিণমুখী। এটি ছ'টি চারকোণা থামের উপর পাঁচটি বহুমুখী খিলানদ্বারা নির্মিত। ভিতরের একটিমাত্র ঘরে ভক্ত মুসলমানেরা নমাজ পাঠ করেন। মসজিদটিতে মোট আঠারটি মিনার আছে—পূর্বে ও পশ্চিমে ছ'টি করে এবং উত্তরে ও দক্ষিণে তিনটি করে। ছাদের উপর মিনারের মাঝে মাঝে ছোট খাঁজকাটা পরট আছে। মিম্বরটি ঘরের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। মসজিদটি সরকারী সাহায্য বিশেষ পায় না ; এটির সংরক্ষণ ও উৎসবাদির খরচ স্থানীয় বিশিষ্ট মুসলমানরাই বহন করেন।

কোচবিহার শহরের অনতিদূরে, গুদাম মহারানীগঞ্জে ও খাগড়াবাড়িতে, একটি করে মসজিদ আছে। শেষেরটি প্রায় এক শ বছরের মত পুরানো ও অন্যটি আরও অর্বাচীন। প্রথমটিতে প্রতি শুক্রবারে ও উৎসবাদির সময়ে প্রভূত জনসমাগম হয়।

গুদাম মহারানীগঞ্জ : কোচবিহার শহরের পৌর এলাকা থেকে মাত্র আধ মাইল দক্ষিণে ও তোর্সা নদীর উপরে রেলসেতুর উত্তর ধারে অবস্থিত মাজারটির নাম তোর্সাপীরধাম। শোনা যায় জনৈক অজ্ঞাতনামা পীর খ্রীষ্টীয় আঠারো শতকের প্রথম দিকে তোর্সা নদীর তীরে সাধনভজন করতেন। তিনি নাকি নানা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। যেমন, তোর্সা নদীর মধ্যে দীর্ঘকাল ডুবে থেকে তিনি যখন যোগাভ্যাস করতেন তখন কোন ভক্ত তাঁর দর্শনার্থী হয়ে এলে, তিনি একটিমাত্র হাত তুলে তাঁর অবস্থিতির কথা জানিয়ে তার মনোবাঞ্ছা পূরণ করতেন। জনশ্রুতি, মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ তাঁর বিশেষ ভক্ত ছিলেন। কিন্তু তোর্সাপীর তাঁকেও বিশেষ কোন সম্ভ্রম দেখাতেন না। হরেন্দ্রনারায়ণ পীরের আস্তানার রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রায় সাত বিঘা পীরোত্তর (পীরপাল) জমি দান করেন। তোর্সাপীরের প্রভাবে বহু লোক ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। উৎসবাদির সময়ে এখানে প্রচুর জনসমাগম হয়ে থাকে। পাগলা কুকুরের কামড়ের প্রতিষেধক হিসাবে এখানে যে দৈব ঔষধ দেওয়া হয় তা খুবই জনপ্রিয়।

মাজারটি প্রায় ৪ ফুট (১·২ মিটার) উঁচু বেদীর উপর স্থাপিত। তার চারপাশে বাঁশের বেড়া ও উপরে টিনের চারচালা। প্রবেশদ্বার পূর্বদিকে। আস্তানাটি কোচবিহার দেবোত্তর সংস্থার অধীনে থাকলেও এটির বর্তমান অবস্থা বিশেষ ভাল নয়।

গোঁসানীমারি বা ভিতর কামতা (দিনহাটা থানা)ঃ গোঁসানীমারি বা ভিতর কামতা মৌজার কামতেশ্বরী দেবীর মন্দিরটি কোচবিহারের বিখ্যাত দেবালয়গুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কোচবিহার শহর থেকে পিচের রাস্তায় দিনহাটা হয়ে অহরহ সেখানে বাসে যাতায়াত করা যায়। এখান থেকে রাজপাট ও গোঁসানীমারি বন্দরের দূরত্ব আধ মাইলের বেশী হবে না। মহারাজ প্রাণনারায়ণ এই দেবালয়ের প্রতিষ্ঠাতা হলেও শোনা যায়, খেনবংশীয় রাজাদের রাজত্বকালেও কামতেশ্বরী দেবীর উদ্দেশে মন্দিরাদি নির্মিত হয়েছিল এবং নীলধ্বজ, চক্রধ্বজ ও নীলাম্বর এবং কান্তেশ্বরের নামও সে প্রসঙ্গে উল্লেখিত হয়ে থাকে। পূর্বোক্ত তিনজন রাজা খেনবংশীয় ছিলেন, কিন্তু শেষোক্তজন কোন্ বংশীয় ছিলেন তা বলা শক্ত। অনেকের মতে কান্তেশ্বর নামে পৃথক কোনও রাজা ছিলেন না—পূর্বোক্ত খেনরাজাদের মধ্যে একজনের হয়ত উপাধি ছিল কান্তেশ্বর বা কামতেশ্বর। খেনরাজারা কামতার অধিপতি ছিলেন বলে তাঁদের 'কামতেশ্বর' বলা হ'ত। খেনরাজাদের পূর্বেও কামতেশ্বর নামের বা উপাধিধারী এক নরপতি কামরূপে রাজত্ব করেছিলেন। সুতরাং, কান্তেশ্বর বলতে এঁকেও বোঝাতে পারে। কামতেশ্বরী দেবীর আদি মন্দির নির্মাণের কৃতিত্ব কার এবং সে মন্দির কোথায় অবস্থিত ছিল বলা কঠিন। নানা সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে মনে হয়, আদি কামতেশ্বরী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হয় নীলধ্বজ, নয় নীলাম্বর। তাঁদের মধ্যে নীলাম্বরের দাবীই অগ্রগণ্য, কেন না হোসেন শাহ নীলাম্বরকেই পরাজিত করে কামতাপুর দুর্গ ও কামতা রাজ্য অধিকার করেন।

এ মন্দিরপ্রাঙ্গণের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে শিবলিঙ্গ ও পালযুগের একটি সুন্দর বিষ্ণুমূর্তি (মাপ—৩´ ৩˝ × ১´ ৭ বা ১ মি. × ৪৯ সে. মি.) এবং দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আর একটি শিবলিঙ্গ দেখা যায়। বিষ্ণুর 'চতুর্বিংশতি-মূর্তিভেদবিধি অনুসারে (অর্থাৎ বিষ্ণুর ২৪ প্রকার মূর্তির মধ্যে) উল্লিখিত বিষ্ণুমূর্তিটিকে 'নারায়ণ'মূর্তি বলে মনে হয়। বিগ্রহটি গরুড়বাহন ও শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী। তাঁর বাম ও ডান দিকে, যথাক্রমে, লক্ষ্মী বা শ্রী ও শঙ্খপুরুষ এবং সরস্বতী ও চক্রপুরুষ আছেন। এই বলভি-মন্দিরটির উপরের এক বিশাল অশ্বত্থের শিকড়জালে দেওয়ালের অনেক স্থানে ফাটল দেখা দিয়েছে। ধনাগার ও ভোগঘরের অবস্থাও ভাল নয়। মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রবেশের জন্য দু'টি দরজা আছে—মূল বা প্রধানটি

পশ্চিম দিকে ও অন্যটি উত্তর দিকে। প্রধান প্রবেশ-পথটির উপরে নহবৎখানা আছে। কামতেশ্বরী দেবীর মূল মন্দির ও হোমঘর বাংলা চারচালারীতির চার কোণা ঘরের বাঁকান কার্নিসের উপরে গোলার্ধাকার গম্বুজ স্থাপন করে গঠিত। 'বাঁকুড়ার মন্দির'-প্রণেতা শ্রীঅময়কুমার বন্দোপাধ্যায়ের মতে, স্থাপত্যের দিক থেকে, এ-মন্দির ও কোন কোন প্রাচীন মসজিদের (যেমন মালদহ জেলার পাণ্ডুয়ার একলাখী মসজিদ) পার্থক্য খুবই কম মাধোস্বরূপ বৎসের মতে এ ইমারতে সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগের মুঘল-স্থাপত্য ও বাংলা চালারীতির মিলন দেখা যায়। মূল মন্দিরের বাহিরের দেওয়াল চুনবালির পলস্তারায় আবৃত। সেখানে কিছু অনুভূমিক পটি ও কুলুঙ্গির ব্যবহারে যে অলংকরণের চেষ্টা হয়েছে তা অকিঞ্চিৎকর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাফলকটি অমসৃণ কালো পাথরে খোদিত এবং পশ্চিম দিকের প্রধান দরজার উপরে নিবদ্ধ। পাথরটির মাপ ৫´ ৩" × ১ × ১০½" (২·৩৩ মি. × ৩১ সে. মি. × ২৭ সে. মি.)। সংস্কৃত ভাষায় কিন্তু প্রাচীন বাংলা হরফে লিখিত এ লিপিটির পাঠ নিম্নরূপ :

ওঁ নমো গণেশায়
সম্যত্যাম্বিষদেকজিহ্বর ভুজদণ্ডপ্রতাপাযস্য
ক্রীড়াকন্দুক বেগবর্দ্ধিত দিশঃ শ্রীপ্রাণভূমিপতেঃ।
শাকাব্দে নগনাগমার্গণ হিমজ্যোতিস্মিতে নিস্মিতঃ
শ্রীভাজা কবিমণ্ডলেন ভজতা ভর্বো ভবানী মঠঃ॥
১৫৮৭

ভিতরের দেওয়ালের চারদিকেই খিলান ও তার পাশে পাশে লহরা। খিলানের উপরে ছোট ছোট উদগত পটি আছে। এই সব ভারবাহী অঙ্গের উপরে বেঁকি এবং গোলাধাকার গম্বুজ স্থাপিত ভিত্তিবেদীসমেত মূল মন্দিরটি প্রায় ৪৫ ফুট (১৪ মিটার) উঁচু। বাহিরের দেওয়ালের দৈর্ঘ্য প্রস্থ একই—২৮´ ৯" (৯·২ মিটার)। গর্ভগৃহে দুটি সিংহাসনে শিবলিঙ্গ, ব্রহ্মা, শালগ্রাম বা নারায়ণশিলা, অষ্টধাতুর গোপালমূর্তি এবং ব্রোঞ্জের সূর্যমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। সূর্যমূর্তিটি ৮ ইঞ্চি (২১ সেন্টিমিটার) উঁচু। তিনি দু'হাতে পদ্ম ধরে দাঁড়িয়ে আছেন ও তাঁর পরিবার-দেবতারূপে দণ্ডী, পিঙ্গল, ঊষা, প্রত্যুষা ও অরুণকে দেখা যায়। মূর্তিটি সম্ভবত সেন যুগের। উত্তর দিকের দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে ২২" × ১১" (৫৭ × ২৯ সেন্টিমিটার) মাপের, কষ্টিপাথরে নির্মিত পাল-

যুগের খুব সুন্দর আর একটি সূর্যমূর্তি আছে। তাঁর দু'হাতে সনালপদ্ম ও কোমরে তরব রি। সারথি অরুণ ছাড়াও তাঁর সঙ্গী হিসাবে দণ্ডী, পিঙ্গল, উষা, প্রত্যূষা ও ছায়া আছেন। রথের সাতটি ঘোড়া-ই পাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে আছে। সাধারণত রথের মাঝের ঘোড়াটির মুখ সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, বিষ্ণু ও সূর্যের প্রাচীন মূর্তিগুলি অন্য জায়গা থেকে এখানে আনীত হয়েছে।

এ দেবালয়ের প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায়, মহারাজ প্রাণনারায়ণের বিজয়রাজ্যে ১৫৮৭ শকাব্দে (সংখ্যায় বা ভাষায় প্রকাশিত তারিখ একই, যথা—নগ=৭, নাগ=৮, মার্গণ=৭, হিমজ্যোতি=১ অর্থাৎ, 'অঙ্কস্য বামাগতিঃ' এই নিয়মে, ১৫৮৭) বা ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কবিমণ্ডলগোষ্ঠীদ্বারা ভবানীদেবীর (কামতেশ্বরী দেবীর অপর নাম) এই সুন্দর মন্দিরটি নির্মিত হয়।

কোচবিহার দেবোত্তর সংস্থার পরিচালনাধীন এ মন্দিরে নিত্যপূজা ছাড়াও নানা পর্বদিনে পূজা, উৎসব ও বলি হয়ে থাকে। দেবীর নামে সমর্পিত প্রচুর দেবোত্তর সম্পত্তির আয় থেকে এই মন্দির তথা কোচবিহারের অনেক মন্দিরের দেবদেবীদের পূজা ও মন্দিরাদির সংরক্ষণের ব্যয় ও কর্মচারীদের বেতন মেটানো হয়।

চামটা (তুফানগঞ্জ থানা) : কোচবিহার-আসাম জাতীয় সড়কের কাছে নাককাটিগাছ থেকে প্রায় ২ মাইল (৩·২ কিলোমিটার) উত্তর-পূর্বে চামটা গ্রামে ঘুর্ণেশ্বরী দেবীর মন্দির অবস্থিত। এটির ভিত্তিবেদী ইট-সিমেন্ট, দেওয়াল কাঠের বেড়া ও চারচালা ছাদ টিনের তৈরী। এ দেবালয়ে একটি ত্রিকোণ ও সিন্দুরলিপ্ত পাথরকে দেবী ঘুর্ণেশ্বরী-জ্ঞানে পূজা করা হয়। পাশে একটি ত্রিশূলও আছে। কালীস্বরূপা এই দেবী ও ত্রিশূলরূপী ভৈরবের নিত্যপূজা হয়। এছাড়া বিশেষ পর্বদিনে দেবীর মহা-আড়ম্বরে পূজা হয় ও প্রচুর জনসমাগম হয়। এখানে ছাগ ও পায়রা বলি প্রচলিত। দক্ষিণমুখী এ মন্দিরের অবস্থা ভাল নয়। মন্দিরের পিছনে এক প্রাচীন বটগাছের নীচে নাকি বহুকাল আগে একটি ত্রিকোণ পাথরের খণ্ড রক্ষিত ছিল ও তার উপরে কাছাকাছি গ্রামের কোন গরু বা মহিষ রোজ সকালে এসে দুগ্ধধারা বর্ষণ করে যেত। এই অলৌকিক ঘটনার কথা লোক-পরম্পরায় মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের কানে উঠলে তিনি ঐ পাথরের খণ্ডটিকে ঘুর্ণেশ্বরীদেবীজ্ঞানে এক মন্দিরের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেন।

বর্তমান মন্দিরটিকে অবশ্য তাঁর তৈরী বলে মনে হয় না ; এটি সম্ভবত নৃপেন্দ্রনারায়ণের সময়ে প্রতিষ্ঠিত।

তুফানগঞ্জ শহর (তুফানগঞ্জ থানা)ঃ তুফানগঞ্জ বাজারের কাছে এক উঁচু ঢিবির উপর মদনমোহন বা গিরিধারীলাল গোপীবল্লভ মন্দিরটি অবস্থিত। একতল ও সমতলছাদবিশিষ্ট এবং ৫০৬০ বছরের বেশী পুরানো নয়। মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ-নির্মিত এই দেবতার আর একটি অধুনালুপ্ত মন্দির এখানেই স্থাপিত ছিল বলে শোনা যায়। বর্তমান মন্দিরে দুটি বড় ও দুটি ছোট রাধাকৃষ্ণের অষ্টধাতুর মূর্তি আছে। বড় দুটি প্রায় ১ ফুট (৩১ সেন্টিমিটার) ও ছোট দুটি প্রায় ৬" (১৬ সেন্টিমিটার) উচ্চতার হবে। নিত্যপূজা ছাড়াও এখানে রথযাত্রা, রাসযাত্রা ও দোলযাত্রার সময়ে বিশেষ পূজা হয়। রথযাত্রায় ব্যবহারের জন্য একটি কাঠের রথও এখানে আছে। দোলের সময় বিগ্রহগুলিকে সামনের টিনের নাটমণ্ডপে এনে রাখা হয়। তিন দিন ধ'রে এই উৎসব ও মেলা চলে। মন্দিরটি কোচবিহার দেবোত্তর বিভাগের অধীন।

দিনহাটা শহর (দিনহাটা থানা)ঃ দিনহাটা মহকুমা অফিসের দক্ষিণ দিকে মদনমোহন বা বলরাম ঠাকুরের মন্দিরটি অবস্থিত। এই গম্বুজশীর্ষ দেবালয়ের সামনের বারান্দার ছাদটি সমতল। সেটি রেলিং দিয়ে ঘেরা। গম্বুজের দুপাশে দুটি থাম ও তার সামনে চারটি থামযুক্ত আর এক প্রস্থ রেলিং আছে। পূর্ব ও পশ্চিম ধারের থাম দুটির উপর কলসও আছে (অন্য দুটির কলস হয়ত ভেঙে গিয়ে থাকবে)। গম্বুজের উপরের ও সামনের দুটি থামের শীর্ষে ব্রহ্মা, শিব ও বিষ্ণুর চুনবালির তৈরী মূর্তি আছে। বহুমুখী তিনটি খিলানকে ধারণ করবার জন্য দক্ষিণ দিকের প্রধান প্রবেশপথের সামনের বারান্দায় মোট চারটি থাম আছে। এই থামগুলির উপরে দালানের ছাদ স্থাপিত। পূর্ব ও পশ্চিম দিকের প্রবেশপথের সামনেও রেলিংঘেরা থাম আছে যার উপরে সেদিকের ছাদগুলি ন্যস্ত। বিগ্রহ—অষ্টধাতুনির্মিত, ৮" (২১ সেন্টি-মিটার) উঁচু—কৃষ্ণ ও বলরামমূর্তি। নিত্যপূজা ছাড়াও রথযাত্রা, জন্মাষ্টমী, রাসযাত্রা ও দোলযাত্রার সময় বিশেষ পূজা, উৎসব ও মেলা হয়। মন্দিরের সামনে টিনের নাটমণ্ডপ ও দোলমণ্ডপ আছে। মন্দিরের গায়ে বাংলায় লেখা প্রতিষ্ঠাফলকটি থেকে জানা যায় যে, মীরেরকুঠি-নিবাসী ধৈর্যনাথ সরকার ও বৈদ্যনাথ সরকারের ব্যয়ে মন্দিরটি ১৩১৪

বাংলা সনে নির্মিত হয়। এটি তাঁদের পরলোকগত পিতার স্মৃতির উদ্দেশে নির্মিত। কিছুকাল আগে মন্দিরটির সংস্কার করা হয়েছে। এছাড়া দিনহাটা শহরে দু'চারটি অর্বাচীন মন্দিরও আছে। এরূপ একটিতে—শঙ্কর মন্দিরে—একটি প্রাচীন কালীমূর্তি ও একটি পাল-সেন যুগের উমা-মহেশ্বর মূর্তি আছে।

ধলিয়াবাড়ি (কোচবিহার থানা): কোচবিহার-দিনহাটা পিচ-রাস্তার ধারে, কোচবিহার শহর থেকে ৪ মাইল (৬·৪ কিলোমিটার) দক্ষিণে, সিদ্ধনাথ শিবের দক্ষিণমুখী মন্দিরটি অবস্থিত। কোচবিহার জেলায় এরকম পোড়ামাটির ফলকযুক্ত পঞ্চরত্ন মন্দির আর নেই। উত্তরবঙ্গে পশ্চিম দিনাজপুর জেলা ছাড়া অন্যত্র এরূপ মন্দির আছে কিনা সন্দেহ। দেবালয়টির বাঁকানো চালের উপরে চার কোণে চারটি রত্ন আছে, কিন্তু মাঝখানের বৃহত্তর রত্নটি অনুপস্থিত। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে হ্যামিলটনও ওই গম্বুজটি দেখতে পান নি। অতএব সেটি তারও আগে ভেঙ্গে গিয়ে থাকবে। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২১'৪" (৬·৪ মিটার) ও বর্তমান উচ্চতায় প্রায় ৩০' (৯·১ মিটার)। পোড়ামাটির ফলক ও সম্ভবত গম্বুজাকৃতি মূল রত্ন ছাড়া এ দেবালয়ের অন্যান্য বিশেষত্ব, এর দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের বাহিরের দেওয়ালে পোড়ামাটির অলংকরণ এবং উত্তর দিকের ভিতরের দেওয়ালের মধ্যভাগে 'মিহরাব'-এর উপস্থিতি। মাধোস্বরূপ বৎসের মতে এই মন্দিরের স্থাপত্যরীতিতে মুসলমানী প্রভাব যথেষ্ট লক্ষ্য করা যায়। অষ্টাদশ শতকে, কোচবিহারে স্বল্পকালীন মুসলমান-অধিপত্যের সময়ে, মন্দিরটিকে হয়ত মসজিদে রূপান্তরিত করার চেষ্টা হয়ে থাকবে, যদিও এবিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। সামনের দেওয়ালের বহির্ভাগে হিন্দুধর্মের সঙ্গে জড়িত যেসব পোড়ামাটির মূর্তি দেখা যায় তা কালপ্রভাবে ক্ষয়িত হয়েছে সত্য, কিন্তু অন্য কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে মনে হয় না। মসজিদে সাধারণত পশ্চিমদিকের দেওয়ালেই 'মিহরাব' থাকে, কিন্তু এখানে মন্দিরটি দক্ষিণমুখী হওয়াতে ও পশ্চিমে আর একটি দরজা থাকায়, 'মিহরাব'টি নিবদ্ধ হয়েছে উত্তরের দেওয়ালে। এটি উচ্চতায় ৯ ফুট (২·৭ মিটার) ও প্রস্থে ৪ ফুট (১·২ মিটার)। দেওয়ালগাত্র থেকে এটি প্রায় ২ ফুট (৬২ সেন্টিমিটার) ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট। প্রবেশ-খিলানটি বহুমুখী ও ৩'৬" (১·১ মিটার) প্রস্থযুক্ত। মন্দিরটি মসজিদে যদি রূপান্তরিত না-ও হয়ে থাকে, তবু এর নির্মাণকার্য সম্ভবত মুসলমান

মিস্ত্রীদের উপর ন্যস্ত ছিল এবং তাঁরা অভ্যাসবশত 'মিহরাব'টিও নির্মাণ করেন। অধুনালুপ্ত, গোলার্ধাকৃতি কেন্দ্রীয় রত্নটি সম্বন্ধে বিশেষ কোন টীকা নিষ্প্রয়োজন, কেন না কোচবিহারের প্রায় সব মন্দিরেই ছাদ ঢাকবার জন্য অনুরূপ রীতি অবলম্বিত হয়েছে যা এ জেলার মন্দির-স্থাপত্যে মুসলমানী ছাদ (ceiling) নির্মাণরীতির প্রভাবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রসঙ্গত, মহারাজ প্রাণনারায়ণকর্তৃক জল্পেশ ও কামতেশ্বরী মন্দির নির্মাণে দিল্লীর মুসলমান স্থপতিদের নিয়োগের কথা বলা যায়। প্রাক্-প্রাণনারায়ণ যুগের কোন মন্দির এখনও কোচবিহারে অক্ষত আছে কিনা বলা যায় না, তবে কামরূপের কামাখ্যা ও হয়গ্রীবমাধবের মন্দির দেখে মনে হয় যে এখানেও পূর্বকালে ওই ধরনের শিখর বা রেখ-মন্দিরও নির্মিত হত। কোচবিহারের প্রায় সব অভগ্ন মন্দিরই মহারাজ প্রাণনারায়ণ ও তৎপরবর্তিকালের হওয়ায় এখানকার হিন্দু-মন্দিরগুলির স্থাপত্যে মুসলমানী স্থাপত্যের প্রভাব পড়েছে ও মন্দিরের ভিতর ও বাহির (এবং শেষের এই প্রকরণটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ) গম্বুজাকারে নির্মিত হয়েছে। কিন্তু একথা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, সে সময়ে অনুরূপ প্রভাব পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার হিন্দু মন্দির নির্মাণের উপরও অবশ্যই প'ড়ে থাকবে, কেন না সে এলাকাতেও মুসলমান আধিপত্য সমভাবেই কায়েম ছিল। কিন্তু সেসব স্থানে ছাদের ভিতরের দিক গম্বুজের আকারে নির্মিত হলেও বাহিরের দিক, প্রায় সব ক্ষেত্রেই, চালা বা রত্ন-শৈলীতে তৈরী হয়েছে। কোচবিহারের ক্ষেত্রে এই গুরুতর পার্থক্য যে সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেকথা, শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতামতের উল্লেখ করে, আগেই বলা হয়েছে।

দক্ষিণমুখী এ মন্দিরের সামনের দেওয়ালে খাঁজকাটা খোপে পোড়ামাটির ফলকগুলি লাগানো আছে। সেগুলির বর্তমান সংখ্যা ৫৫ হলেও মনে হয় আগে প্রতিটি খোপেই একটি করে ফলক ছিল। এখন অনেক খোপ শূন্য ও অন্যান্যগুলির কারুকার্য হয় লোনা ধ'রে, নয় ত চুনকামের চুন লেগে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। এগুলিতে দশাবতার, নানা পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তি ছাড়া বন্দুকধারী পল্টন, কয়েকটি নর্তকীমূর্তি ও লতাপাতার অলংকরণ দেখা যায়। আশ্চর্যজনকভাবে, শেষোক্ত কারুকার্যগুলির, বর্ধমান জেলায় দৃষ্ট অনুরূপ কারুকৃতির সঙ্গে বেশ সাদৃশ্য আছে। মন্দিরের প্রবেশদ্বারের উপরের খিলান বহুমুখী

ও ছুঁচালো, এবং তার নীচে, দুপাশে, দুটি থাম আছে। থামের গায়ে পলকাটা আমলকের অলংকরণ দেখা যায়। মন্দিরটির ভিত্তিবেদী এখন এত নীচু যে সেটি কালক্রমে বসে গেছে বলে মনে হয়। মন্দিরের দেওয়ালে ৪'১০" (১'৫ মিটার) পুরু। ভিতরের দেওয়ালের কোণে কোণে লহরার বিন্যাস করে যে আটকোণা ভিত্তির সৃষ্টি হয়েছে তার উপরে সরাসরি গম্বুজটি স্থাপন করা হয়েছে, মাঝে কোন গ্রীবা বা বেঁকি নির্মাণ করা হয় নি। সেজন্য গম্বুজটির উচ্চতা খুব একটা বেশী ছিল বলে মনে হয় না। গম্বুজের ভিতরের দিকের কেন্দ্রস্থলকে আবৃত করে একটি পদ্মের অলংকরণ যে ছিল তা এখনও দেখলে বেশ বোঝা যায়। প্রধান বিগ্রহ সিদ্ধনাথ শিবলিঙ্গ ছাড়া একটি নারায়ণশিলাও এখানে উপাসিত হন। শিবরাত্রির সময়ে এখানে বিশেষ পূজা ও উৎসব হয়। মাধোস্বরূপ বৎসের মতে, মন্দিরটি মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের সময়ে নির্মিত হয়, কিন্তু হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর মতে এটির নির্মাণকার্য মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের সময়ে আরম্ভ হয়ে তৎপুত্র মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণের সময়ে শেষ হয়। শেষোক্ত মতই যে যুক্তিগ্রাহ্য তার প্রমাণ মেলে এ মন্দির সম্পর্কে হ্যামিলটনের বিবরণ থেকে। সুতরাং, মন্দিরটি যে উপেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালেই নির্মিত হয়েছিল, সে সম্বন্ধে কোন ভুল নেই। তবে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ও মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণ মন্দিরটির সংস্কার করে থাকতে পারেন।

সিদ্ধনাথ শিবের মন্দির থেকে প্রায় সিকি মাইল (০'৪ কিলোমিটার) উত্তরে একটি খোলা জায়গায় শাহপীরের দরগা বা আস্তানাটি অবস্থিত। শোনা যায়, শাহপীর নামে এক ফকির খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ধলিয়াবাড়ির এই স্থানে বসতি শুরু করেন। অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সেই পীরের মৃত্যুর পর তাঁর দেহ স্থানীয় আস্তানায় সমাধিস্থ করা হয়। খোলা জমিটির একপাশে বাঁশের খুঁটিযুক্ত টিনের যে দোচালাটি দেখা যায় লোকে সেটিকেই বলেন শাহপীরের আস্তানা আর সামান্য উত্তরে বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা যে কবরটি দেখা যায়, সেটিকে বলেন পীরসাহেবের কবর। মহরম প্রভৃতি মুসলমান পর্বের সময় এখানে প্রচুর জনসমাগম হয় ও ভক্তেরা মানতাদি করেন। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের সময়ে এই পীরের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য কোচবিহার রাজসরকার থেকে ৭৭ বিঘা পীরোত্তর (পীরপাল) জমি দান করা হয়।

নাককাটিগাছ (তুফানগঞ্জ থানা) : তুফানগঞ্জ শহর থেকে প্রায় ৫ মাইল (৮ কিলোমিটার) দক্ষিণে ও জাতীয় সড়ক থেকে প্রায় আড়াই মাইল (৪ কিলোমিটার) দক্ষিণে যণ্ডেশ্বর বা যজ্ঞেশ্বর মন্দিরটি অবস্থিত। 'রাজোপাখ্যান' প্রভৃতি পুস্তকে এখানকার শিবকে ষাণ্ডেশ্বর শিব বলেই অভিহিত করা হয়েছে, যজ্ঞেশ্বর নয়। জনশ্রুতি, মহারাজ নরনারায়ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শুক্লধ্বজ বা চিলারায় এই গ্রামে ষাণ্ডেশ্বর (অর্থাৎ ষণ্ডেশ্বর) শিবের বা ছোট মহাদেবের একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এখানে কোন মন্দির নির্মাণ করেছিলেন বলে জানা যায় না, তবে মূর্তিপ্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে হয়ত মন্দির প্রতিষ্ঠাও করেছিলেন। 'রাজোপাখ্যান' প্রভৃতি গ্রন্থের মতে এই মন্দির মহারাজ প্রাণনারায়ণকর্তৃক সুসংস্কৃত হয়। হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর মতে যজ্ঞেশ্বর শিবের মন্দিরটি সম্ভবত নাজিরদেও খগেন্দ্রনারায়ণকর্তৃক নির্মিত। কিন্তু বেশী নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্যপ্রমাণে মনে হয়, মূর্তিসহ মন্দিরটি শুক্লধ্বজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। পরে প্রাণনারায়ণ ও খগেন্দ্রনারায়ণ বিভিন্ন সময়ে সেটির সংস্কার করেন। অবশ্য এমনও হতে পারে যে, নাজিরদেওয়ের সময়ে মন্দিরটি এতই ক্ষতিগ্রস্ত হয় যে, তিনি সেটিকে পুনর্নির্মাণ করতে বাধ্য হন। সেই সূত্রে মন্দিরটি নাজিরদেওকর্তৃক নির্মিত বলেই লোকশ্রুতি। টিনের চারচালাযুক্ত এই ইটের মন্দিরটি ২০০।২৫০ বছরের বেশী পুরানো হবে না। পাকা ভিত্তি-বেদীর উচ্চতা সামান্য। পশ্চিমমুখী মন্দিরের প্রবেশপথের সামনে একটি ঢালু টিনের চাল আছে। এখানে যে প্রাচীনতর একটি মন্দির ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় বর্তমান মন্দিরের পিছনের (পুবের) ধ্বংসস্তূপ থেকে যেখানে ভগ্ন গম্বুজ ও থাম প্রভৃতি দেখা যায়। মনে হয় এই বিনষ্ট মন্দিরটি কোচবিহারের অন্যসব মন্দিরের মত চারচালার উপরে গম্বুজশোভিত ছিল। বর্তমান মন্দিরে শিবলিঙ্গের নিত্য-পূজা হয়। শিবরাত্রি ও দুর্গপূজার সময়ে এখানে বিশেষ পূজা ও উৎসব হয়ে থাকে। দ্বীপরপার নামে তুফানগঞ্জ থানার এক গ্রামে অশোকাষ্টমী উৎসব উপলক্ষে বহু লোক গ্রামের প্রান্তবর্তী রায়ডাক নদে স্নান করতে আসেন। তাঁদের বিশ্বাস, ওই সময়ে নাককাটিগাছ গ্রামের ষণ্ডেশ্বর শিবের মন্দির থেকে মহাদেবও ওই নদে এসে অলক্ষ্যে স্নান করে যান। নাককাটিগাছের এ দেবালয়টিও কোচবিহার দেবোত্তর সংস্থার অধীন।

বাণেশ্বর (কোচবিহার থানা) : কোচবিহার শহর থেকে প্রায় ৬

মাইল (১০ কিলোমিটার) উত্তরে কোচবিহার-আলিপুরদুয়ার পিচ-রাস্তার (যে রুটে নিয়মিত বাস চলে) ধারে এবং বাণেশ্বর রেলস্টেশনের পাশেই উত্তরবঙ্গ ও আসামের হিন্দুদের কাছে বিখ্যাত বাণেশ্বর শিবমন্দিরটি অবস্থিত। ব্রড-গেজ রেলপথের নিউ জলপাইগুড়ি-যোগীগোফা সেক্সনের নিউ বাণেশ্বর রেলস্টেশনটিও এ মন্দির থেকে এক মাইল (১'৬ কিলোমিটার) উত্তর-পূর্বে অবস্থিত।

বর্তমান মন্দিরটি খুব প্রাচীন ব'লে মনে না হলেও স্থানীয় জনসাধারণ এটিকে এত পুরাতন ব'লে মনে করেন যে, এটি কবে বা কোন্ রাজার সময়ে প্রথমে তৈরী হয়েছিল তা তাঁরা বলতে পারেন না। তবে প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে নিম্নলিখিত রাজাদের নাম শোনা যায় :—রাজা বাণ বা বাণাসুর, রাজা জল্পেশ্বর, রাজা নীলাম্বর, মহারাজ নরনারায়ণ এবং মহারাজ প্রাণনারায়ণ। প্রকাশ, পৌরাণিক যুগের রাজা বাণ বা বাণাসুরের নামেই এখানকার শিবের বাণেশ্বর নাম হয়। এ সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। একটি কিংবদন্তী অনুযায়ী, তাঁর গভীর শিবভক্তির পুরস্কারস্বরূপ শিবকে স্বর্গলোক থেকে আনবার সময় রাজা বাণ কোন বিশেষ কারণে বর্তমান বাণেশ্বর গ্রামের (প্রাচীন নাম গের্দসাগুরা) কাছে থেমে গেলে ও শর্ত ভঙ্গ করলে শিব অদৃশ্য হয়ে যান ; পরে শিব কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে অদূরের বংক্তি নদীর তীরে নিজ নামে একটি শিবলিঙ্গমূর্তির প্রতিষ্ঠা করে চিরস্মরণীয় হন। কিন্তু তিনি কোনও মন্দির নির্মাণ করেছিলেন কিনা তা জানা যায় না। অনেকের মতে মন্দিরটি জল্পেশ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা রাজা জল্পেশ্বরকর্তৃক নির্মিত। তাঁর রাজত্বকাল সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না, তবে শোনা যায়, তিনি আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকে বর্তমান ছিলেন। 'জল্পেশ-মাহাত্ম্য' নামক গ্রন্থে এই নৃপতির উল্লেখ আছে। কেউ কেউ মনে করেন, এই দেবালয় খেনবংশীয় প্রসিদ্ধ রাজা নীলাম্বরকর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। কোচরাজা মহারাজ নরনারায়ণকেও এ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা-রূপে বলা হয়ে থাকে। 'রিপুঞ্জয় দাশের বংশাবলী' মতে তিনি এখানে বাণেশ্বর শিবের জন্য একটি মন্দির নির্মাণ করেন ও এই স্থানের নাম রাখেন 'গের্দসাগুরা'। ওই একই পুস্তকের অন্যত্র বলা হয়েছে, মহারাজ প্রাণনারায়ণ মন্দিরটির প্রয়োজনীয় সংস্কার করেন। এ থেকে মনে হয়, বাণেশ্বর শিবের মন্দিরটি প্রাণনারায়ণের রাজত্বকালের আগেই নির্মিত হয়েছিল। সেক্ষেত্রে মন্দিরটি নরনারায়ণের দ্বারা নির্মিত

হওয়া সম্ভব। প্রাণনারায়ণের সময়ে সংস্কারের ফলে মন্দিরের পূর্বরূপ কি ছিল তা জানা কঠিন। বর্তমানে পশ্চিমমুখী এ মন্দিরটির আকৃতি গম্বুজযুক্ত চারকোণা ঘরের মত, যার কার্নিস সামান্য বাঁকানো। মন্দিরগহ্বরে শিবলিঙ্গ ও গৌরীপট্ট প্রতিষ্ঠিত, তবে সেখানে পৌঁছ'তে হলে মন্দিরের পশ্চিম বা উত্তরের দরজা থেকে (এর দু'দিকেই প্রবেশপথ আছে) প্রায় ১০ ফুট (৩·১ মিটার) নীচে সিঁড়ি দি'য় নামতে হয়। বাইরের সমতল থেকে এরূপ নীচে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্রও দেখা যায়। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ভূমিকম্পের ফলে বিগ্রহসমেত মন্দিরের মেঝে ও দেওয়াল পূর্বদিকে সামান্য হেলে গেছে। ইমারতটির উচ্চতা ৩৫ ফুট (১০·৯ মিটার), দৈর্ঘ্যপ্রস্থ ৩১ ফুট (৯·৬ মিটার) ও দেওয়াল ৮ ফুট (২·৫ মিটার) পুরু। পার্বত্য-ত্রিপুরার মন্দিরের মত এই মন্দিরটির পশ্চিম দিকের বাইরের দেওয়ালে চারটি সমান্তরাল পটির মত অলংকরণ দেখা যায়। চালের নীচে এই অলংকরণ সামান্য বাঁকানো। সামনের ও দু'পাশের দেওয়ালে অল্প-উদ্গত নবরথ অলংকরণ আছে। পশ্চিম দিকের প্রধান দরজার উপরের খিলানটি বহুমুখী ও ছুঁচালো। মন্দিরের ভিতরের গাঁথনি ও অলংকরণ লক্ষ্য করবার মত। দরজার সামান্য উপর থেকে দেওয়াল কিছুটা খাড়াভাবে উঠে গিয়ে একটু উপরের দিকে আটকোণার আকৃতি নিয়ে খিলান অবধি গেছে। এই আটকোণাকৃতি অংশের প্রতিটি কোণের উপরে একটি করে খিলান তৈরী করে ঐ খিলানের উপরে লহরার সৃষ্টি করা হয়েছে। লহরার উপরের দিকটি বৃত্তের মত, তার উপরে গ্রীবা বা বেঁকি স্থাপন করা হয়েছে। গ্রীবার উপরে পর পর, গোলার্ধাকার গম্বুজ, পদ্ম, পলকাটা আমলক, কলস ও ত্রিশূল স্থাপন করা হয়েছে। মন্দিরের সামনে একটি ৩ ফুট (৯৩ সেন্টিমিটার) উঁচু বিরাট চত্বর আছে। বিশেষ পূজার সময়ে এটি নাটমণ্ডপের কাজ করে। কোচবিহার দেবোত্তর সংস্থার অধীন এ মন্দিরটির অবস্থা ভাল। তাঁদেরই ব্যবস্থাপনায় দেবতার নিত্যপূজা ও শিবরাত্রির সময়ে বিশেষ পূজা, বলি, উৎসব ও মেলা হয়ে থাকে।

মন্দিরের উত্তরে, চত্বরের পাশ-বরাবর, এক দেওয়ালের গায়ে বসানো পাথরের একটি ছোট বিষ্ণুপট্ট ও একটি পিতলের চণ্ডীমূর্তি আছে। বিষ্ণুপট্টটিতে প্রচলিত লক্ষ্মী, সরস্বতী ছাড়া, অভিনবভাবে, গঙ্গা ও যমুনার মূর্তিও উৎকীর্ণ করা হয়েছে। ডান পাশে এক উঁচু বেদীর উপর সিমেন্টের একটি ষাঁড় দেখা যায়। এই দিকে ভুবনেশ্বরী

দেবীর একটি মূর্তি ছিল ; সেটি নাকি চুরি হয়ে গেছে। চত্বরের উত্তর দিকে একটি টিনের চারচালা মন্দিরের ভিতরে শিব ও অর্ধনারীশ্বরের পিতলের মূর্তি উপাসিত। শিবমূর্তিটির মাপ ৫"×৪" (১৩×১০২ সেন্টিমিটার)। তাঁকে এক ত্রিরথ সিংহাসনের উপরে পদ্মাসনে বসে থাকতে দেখা যায়। তাঁর ডান হাত ভূমিস্পর্শ-মুদ্রায় ও বাঁ হাত ধ্যান-মুদ্রায় ন্যস্ত। ভূমিস্পর্শ-মুদ্রার জন্য মূর্তিটিকে বুদ্ধমূর্তি বলে মনে হয়। দেবতার মাথায় জটাভার ও তার পিছনে সাপ আছে। শিবের বাঁ পাশে পদ্মাসনে উপবিষ্ট অর্ধনারীশ্বর মূর্তিটির মাপ ১১"×১০২" (২৯×২৭ সেন্টিমিটার)। সেটি শিব ও দুর্গার সম্মিলিত রূপ ; ডান অঙ্গটি শিবের ও বাম অঙ্গটি দুর্গার। শিবের মাথায় জটাভার ও দুর্গার মাথায় অর্ধপদ্মাকৃতি মুকুট দেখা যায়। শিবের হাতের একটিতে কপাল ও অন্যটিতে কটক-মুদ্রা। দুর্গারও দুটি হাতের একটি কর্তরী-মুদ্রায় ও অন্যটি কটক-মুদ্রায় রাখা। দোলপূর্ণিমা ও মদনোৎসবের সময় অর্ধনারীশ্বর মূর্তিটিকে কোচবিহার শহরের মদনমোহন মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। এইভাবে স্থানান্তরিত হয় বলে এটিকে উৎসবমূর্তি বা চলন্ত বাণেশ্বরমূর্তি বলা হয়। এ মন্দিরের মধ্যে অন্য যেসব বিগ্রহ আছে তাদের মধ্যে অনন্তদেব, যজ্ঞেশ্বর শিবলিঙ্গ ও শালগ্রামশিলা প্রধান। সমস্ত দেবদেবীরই নিত্যপূজা হয়।

বাণেশ্বর মন্দিরের সামান্য পশ্চিমে নীচু ভিত্তিবেদীর উপরে একটি টিনের চারচালা মন্দির আছে। সেখানে প্রায় ৩'৬" (১'১ মিটার) উঁচু একটি পাথরের কালীমূর্তি আছে। দেবীর নিত্যপূজা ছাড়াও প্রতি অমাবস্যা, সংক্রান্তি ও বাৎসরিক কালীপূজার দিন বিশেষ পূজা হয়।

বাণেশ্বর মন্দিরের ভিতরে, পূর্বদিকে একটি ধাপের উপরে অষ্ট-ধাতুর ১'৬" (৪৬ সেন্টিমিটার) উঁচু একটি মূর্তিকে স্থানীয় লোকেরা বাণাসুরের মূর্তি বলে মনে করেন। স্বর্গত বৎসের মতে মূর্তিটি শিবানুচর নন্দীর। কিন্তু মূর্তিটির মুখ ষাঁড়ের মত নয়, অনেকটা বানরের মত এবং দু'হাতে ত্রিশূল আছে। মন্দিরের দক্ষিণে মোহনদীঘি নামে একটি খুব বড় পুষ্করিণী দেখা যায়। সেখানে বাণেশ্বর-আশ্রিত বহু কচ্ছপের বাস। পুণ্যার্থীরা তাদের কোন ক্ষতি তো করেন-ই না, উপরন্তু ঘাটের কাছে তাদের জন্য খাদ্যবস্তু ছড়িয়ে দেন। এই দীঘি থেকে কিছুকাল আগেও কয়েকটি দেবদেবীর পাথরের মূর্তি পাওয়া

গেছে। সেগুলি এখন কোথায় আছে জানা যায় না, তবে আগে যে বিষ্ণুপট্টটির কথা বলা হয়েছে সেটি এখান থেকেই পাওয়া।

শিবরাত্রির সময়ে এই মন্দিরে মহাসমারোহে বিশেষ পূজা হয়ে থাকে। তখন মানত পূরণের জন্য যাত্রীরা অনেক পশুপক্ষী দেবতাকে উৎসর্গ করে থাকেন। তাদের কিছুসংখ্যককে দেবতার কাছে উৎসর্গ করে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু বলির পশুপক্ষী সম্পর্কে নানাপ্রকার রীতি প্রচলিত আছে। কোনটিকে হাঁড়িকাঠে বলি দেওয়া হয়, কোনটিকে গলায় ফাঁস দিয়ে নীচু করে ঝুলিয়ে দম বন্ধ করে মারা হয়, কোনটিকে আবার মাটিতে আছড়ে মারা হয়। বলির পশুপক্ষী সাধারণত ছাগল, পায়রা ও মোরগ। কামরূপের কামাখ্যা মন্দিরেও সাধারণত পায়রা বলি দেওয়া হয়ে থাকে। ধর্মীয় ও সামাজিক দিক থেকে আসামের কামরূপের সঙ্গে কোচবিহারের যোগসূত্র নিবিড়, তাই অন্যান্য তান্ত্রিক প্রথার মত পায়রা বলিও কোচবিহারের দেব-দেবীদের পূজার বিশেষ অঙ্গস্বরূপ।

বারকোদালি (তুফানগঞ্জ থানা): তুফানগঞ্জ শহর থেকে প্রায় ৮ মাইল (১৩ কিলোমিটার) দক্ষিণে বারকোদালি গ্রামে দামেশ্বর শিবমন্দিরটি অবস্থিত। ৩১ নং জাতীয় সড়ক এই গ্রামের প্রায় পাশ দিয়ে গেছে ব'লে এটি পিচ-রাস্তাদ্বারা কোচবিহার শহরের সঙ্গে যুক্ত। এ পথে নিয়মিত বাস চলাচল করে। মন্দিরটির দেওয়াল ও উপরের চারচালা টিনের, কিন্তু ভিত্তিবেদী ও মেঝে পাকা। মন্দিরের দরজা পশ্চিমমুখী। এখানকার দামেশ্বর শিবলিঙ্গকে লোকে বড়-মহাদেব-জ্ঞানে পূজা করে। জনশ্রুতি, শুক্লধ্বজ এ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা। সেজন্য এখানে একটি মন্দিরও তিনি নিশ্চয় স্থাপন করেছিলেন। সে মন্দিরের কোন চিহ্ন বর্তমানে দেখা যায় না। এখানকার মন্দিরটি মোটেই পুরানো নয়। মন্দিরে শিবলিঙ্গ ছাড়া কালী ও নারায়ণ (শালগ্রামশিলা) মূর্তি আছেন। কালীমূর্তিটি অষ্টধাতুর ও প্রায় ৮" (২১ সেন্টিমিটার) উঁচু। দেবদেবীদের নিত্যপূজা ছাড়াও রথযাত্রা, কালীপূজা, শিবরাত্রি, দোল-যাত্রা প্রভৃতি উৎসবের সময় এখানে বিশেষ পূজাদি হয়ে থাকে। রথের সময় ব্যবহারের জন্য এখানে একটি কাঠের রথও আছে। মধ্যযুগের ভারতবর্ষের নানা স্থানের মত কোচবিহারেও বিভিন্ন ধর্ম-মতের সহাবস্থান ছিল ও পঞ্চোপাসক স্মার্তের বসবাস ছিল। সেজন্য কোন বিশেষ দেব বা দেবীর মন্দিরে ভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের দেবদেবীরও

পূজা ও উৎসবে আশ্চর্যের কিছু ছিল না। কোচবিহার দেবোত্তর বিভাগ থেকে এ মন্দির ও বিগ্রহগুলির রক্ষণাবেক্ষণ হয়ে থাকে। অশোকাষ্টমীর দিন দ্বীপরপার গ্রামের প্রান্তবর্তী রায়ডাক নদে বড়-মহাদেব ও ছোট-মহাদেব স্নান করতে যান বলে স্থানীয় লোকের বিশ্বাস।

বৈকুণ্ঠপুর (কোচবিহার থানা). কোচবিহার শহরের নীলকুঠি রোড থেকে কিছু দূরে ও সিদ্ধেশ্বরী গ্রামের প্রায় ২½ মাইল (৪ কিলোমিটার) উত্তর-পূর্বে বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে দামোদরদেবের অধুনা-লুপ্ত ধামের পাশে বৈকুণ্ঠনাথের মন্দিরটি অবস্থিত। এ দেবালয়ের ছাদ টিনের চারচালা, দেওয়াল অর্ধেক টিনের ও অর্ধেক কঞ্চির এবং মেঝে ও বেদী মাটির। কৃষ্ণ-বলরামের প্রায় ১ ফুট (৩১ সেন্টিমিটার) উঁচু অষ্টধাতুর দুটি মূর্তি সিংহাসনের উপর স্থাপিত। শোনা যায়, মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ এই গ্রামে বৈকুণ্ঠনাথের একটি মূর্তি স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু কোন মন্দির নির্মাণ করেছিলেন কিনা জানা যায় না। বৈকুণ্ঠ-নাথের নাম থেকেই গ্রামের নাম বৈকুণ্ঠপুর। বর্তমান মন্দিরটি পুরানো নয়। এককালে এ গ্রামটি খুবই বর্ধিষ্ণু ছিল ও এখানে রায়কত উপাধিধারী মন্ত্রীদের বাস ছিল। শোনা যায়, মহারাজ বিশ্বসিংহের ছোট ভাই শিষ্যসিংহ এই গ্রামেরই অধিবাসী ছিলেন। দোলযাত্রা, রথযাত্রা, রাসযাত্রা ও অসমীয়া বৈষ্ণবধর্মপ্রচারক দামোদরদেবের তিরোভাব-তিথিতে এখানে উৎসব হয়ে থাকে। কামরূপদেশীয় এক ব্রাহ্মণ-পুরোহিত দেবতাদের নিত্যপূজা চালান।

ভুচুংমারি আবাস্থলি (তুফানগঞ্জ থানা): কোচবিহার শহরের প্রায় ১২ মাইল (১৯ কিলোমিটার) উত্তর-পূর্বে ও নাটাবাড়ি গ্রাম থেকে প্রায় ৩½ মাইল (৫½ কিলোমিটার) দক্ষিণ-পশ্চিমে ভুচুংমারি গ্রামে বলরাম ঠাকুরের মন্দিরটি অবস্থিত। দেবালয়টি এক সাধারণ চালাঘর। বিগ্রহ, পিতলের বলরাম। কৃষ্ণ, গণেশ ও নাড়ুগোপালেরও নিত্যপূজা হয়। বলরামের দুটি মূর্তির মধ্যে বড়টি প্রায় ১ ফুট (৩১ সেন্টিমিটার) ও ছোটটি প্রায় ৬ ইঞ্চি (১৫·৫ সেন্টিমিটার) উঁচু। বড়-বলরামের মাথায় মোহনচূড়া ও দু'হাতে রূপার গদা ও মুগুর আছে। রথযাত্রা, জন্মাষ্টমী ও দোলের সময় এখানে বিশেষ পূজা হয়ে থাকে। মন্দিরটি যদিও এখন ভগ্ন, তবু পূজার খরচাদি ও কর্মচারীদের বেতন কোচবিহার দেবোত্তর বিভাগ থেকে দেওয়া হয়।

যে স্থায়ী ও পাকা মন্দিরটিতে দেবতারা পূর্বে পূজিত হতেন তার ধ্বংসাবশেষ বর্তমান চালাঘরের সামনেই দেখা যায়। সে ধ্বংসস্তূপ থেকে মনে হয়, মন্দিরটি একতলা দালান-মন্দির ছিল।

মধুপুরধাম (কোচবিহার থানা) ঃ কোচবিহার শহর থেকে প্রায় ৬ মাইল (৯½ কিলোমিটার) উত্তর-পশ্চিমে মধুপুর গ্রামে বিখ্যাত বৈষ্ণব তীর্থস্থান মধুপুরধাম অবস্থিত। কোচবিহার-ফলাকাটা পিচের সড়কে প্রথম ৫ মাইল (৮ কিলোমিটার) গিয়ে, বাঁহাতি অপেক্ষাকৃত ছোট পিচের রাস্তায়, আরও ১ মাইল (১.৬ কিলোমিটার) গেলে সেখানে পৌঁছানো যায়। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে, রেখ-দেউলের অক্ষম অনুকরণে, এখানে যে পাকা মন্দিরটি তৈরী করা হয়েছে তা শঙ্করমন্দির বা শ্রীমন্দির নামে পরিচিত। পূর্বমুখী এ মন্দিরের দেওয়ালের ও শিখরের প্রস্থচ্ছেদ আটকোণা ; দেওয়ালের প্রতিটি অংশের (বাহুর) দৈর্ঘ্য ১৪′ ৫″ (৪.৫ মিটার)। অনুচ্চ বেদীর উপর স্থাপিত এ দেবালয়টি উচ্চতায় প্রায় ৫০ ফুট (১৫.৫ মিটার)। কোচবিহাররাজ, আসাম সরকার ও অসমীয়া বৈষ্ণব ভক্তদের অর্থসাহায্যে এটি নির্মিত। এর সামনে সমতল ছাদের একটি ঢাকা নাটমণ্ডপ আছে। দেবগৃহটি প্রদক্ষিণ করবার জন্য দুটি প্রবেশপথযুক্ত একটি প্রদক্ষিণ-পথও আছে। মন্দিরের বহির্ভাগ ও নাটমণ্ডপের মেঝে শ্বেতপাথরের টালি দিয়ে ঢাকা। প্রবেশ-পথের ঠিক উপরে দেওয়ালের গায়ে বালি ও সিমেন্ট দিয়ে গঠিত শুকদেব, পরীক্ষিৎ, সুগ্রীব, গজলক্ষ্মী, গরুড় ও হনুমানের মূর্তি উৎকীর্ণ। মন্দিরের শিখরদেশে যথারীতি পদ্ম, আমলক, কলস, ও বিষ্ণুচক্র দেখা যায়। শ্রীমন্দিরের গর্ভগৃহে একটি উঁচু রূপার সিংহাসনের উপরে 'ভাগবত'-এর দশম স্কন্ধের একটি পুঁথি, অসমীয়া বৈষ্ণব ধর্মগুরু শঙ্করদেব ও মাধবদেবের একখানি যুগল ছবি, তাঁদের অস্থিখণ্ড, রূপার হার, জপমালা, তিলক, শঙ্করদেবের ব্যবহৃত দোয়াত-কলম, মাধবদেবের জুতা, 'নারায়ণী মুদ্রা' প্রভৃতি রক্ষিত আছে। জনশ্রুতি, মহারাজ নরনারায়ণ শঙ্করদেবের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে উল্লিখিত রূপার হারটি উপহার দিয়েছিলেন। গর্ভগৃহে সাতটি পুরানো দীপস্তম্ভও দেখা যায়। শ্রীমন্দির ছাড়া এখানে আর যেসব কাঁচা মন্দির আছে তাদের মধ্যে ভাজঘর, কীর্তনঘর ও দোলমন্দির উল্লেখযোগ্য। এগুলি টিনের ও চারচালাযুক্ত। ভাজঘরে মদনমোহন, চতুর্ভুজ বিষ্ণু প্রভৃতির যে ন'টি অষ্টধাতুর মূর্তি ছিল সেগুলি অপহৃত হয়েছে। কীর্তনঘরে বাসুদেব-কৃষ্ণের অষ্টধাতুর মূর্তি ও

'ভাগবত'এর পুঁথি আছে। এই কীর্তনঘরেই এক সময়ে শঙ্করদেব, মাধবদেব ও দামোদরদেব কীর্তন করতেন। এখনও এই ঘরে শঙ্করপন্থী মহাপুরুষীয়া বৈষ্ণবদের দীক্ষা দেওয়া হয়। এ সব ক'টি মন্দিরই দক্ষিণমুখী। শঙ্করদেবের দশ জন শিষ্য বা 'মুকুত'র বাসস্থানের চিহ্নও এখানে দেখা যায়। এটি শঙ্করপন্থী বৈষ্ণবদের একটি প্রধান তীর্থস্থান। শঙ্করদেব ও মাধবদেব এই ধামে অবস্থানকালে বেশ কয়েকটি অসমীয়া পদ বা 'ঘোষা' রচনা করেন। কোচবিহারের মহারাজ বীরনারায়ণ ও তাঁর পুত্র প্রাণনারায়ণ এই ধামের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বহু জমিজমা দান করে গেছেন। শোনা যায়, মহারাজ বীরনারায়ণ ও মহারাজ প্রাণনারায়ণ এখানে প্রায়ই আসতেন ও রাজবেশ ত্যাগ করে সাধারণ ভক্তের মতই দিনযাপন করতেন। এখানে রাসযাত্রা, দোলযাত্রা, শঙ্করদেবের আবির্ভাব ও তিরোভাব-তিথি ও এই ধামের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা গোবিন্দ আঁতৈর (প্রসিদ্ধ অসমীয়া বৈষ্ণবাচার্য) তিরোভাব-তিথি উপলক্ষে বিশেষ উৎসব হয়।

আদিতে এখানে টিনের তিনটি চারচালা মন্দির নির্মিত হয়েছিল। তার একটিতে শ্রী বা শঙ্করমন্দির, দ্বিতীয়টিতে বিষ্ণু বা গদাধরের চতুর্ভুজ মূর্তি ও তৃতীয়টিতে কীর্তনঘর প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রথমটির স্থানে নূতন পাকা মন্দিরটি তৈরী হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয়টির বেলায় তা না হলেও বহুবার সংস্কারকার্য্য হয়েছে ব'লে মনে হয়। বিষ্ণুর মূর্তিটি মহারাজ প্রাণনারায়ণের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

সিদ্ধেশ্বরী গ্রাম (কোচবিহার থানা) ঃ বাণেশ্বর শিবের মন্দির থেকে মাত্র ১½ মাইল (২½ কিলোমিটার) দক্ষিণ-পূর্বে ও নিউ বাণেশ্বর রেলস্টেশন থেকে মাত্র এক মাইল (১'৬ কিলোমিটার) উত্তর-পশ্চিমে সিদ্ধেশ্বরী গ্রামে সিদ্ধেশ্বরী দেবীর দক্ষিণমুখী, পাকা, আটকোণা ও গম্বুজবিশিষ্ট মন্দিরটি অবস্থিত। উচ্চতায় প্রায় ৩০ ফুট (৯'৩ মিটার) এ দেবালয়ের সামনে প্রায় ২½ ফুট (৭৮ সেন্টিমিটার) উঁচু এক পাকা চত্বর আছে। বাণেশ্বর মন্দিরের মত এ চত্বরের উচ্চতা ও মন্দিরের দরজার উচ্চতা একই, তবে গর্ভগৃহের মেঝে বেশ কিছুটা নীচে। চত্বরটি মনে হয় পরে করা হয়েছে, কেন না অন্য তিন দিকে মন্দির প্রদক্ষিণ করতে হলে ভক্তকে চত্বর থেকে একটু নীচে নেমে যেতে হয়। গর্ভগৃহে সিংহাসনের উপর পিতল বা অষ্টধাতুর তৈরী উপবিষ্টা সিদ্ধেশ্বরী মূর্তিটির উচ্চতা প্রায় ৬ ইঞ্চি (১৫'৫ সেন্টিমিটার) দেবী

চতুর্ভুজা ও শায়িত শিব কিংবা মহাকালের বুকের উপরে সমাসীনা। তাঁর উপরের দুই হাতে কর্তরী ও খড়্গ এবং নীচের দুই হাতে কপাল বা দর্পণ ও অভয়মুদ্রা। দেবীকে কালীজ্ঞানে সিদ্ধেশ্বরী দেবীরূপে পূজা করা হয়। মূর্তিটি ১০০ বছরের বেশী পুরানো হবে ব'লে মনে হয় না। এছাড়া একটি শিবলিঙ্গও এখানে আছে। তাঁদের নিত্যপূজা ছাড়াও দুর্গাপূজা, কালীপূজা, অমাবস্যা ও সংক্রান্তিতে বিশেষ পূজা হয়। দেবীর কাছে এখানেও অনেক ছাগল, পায়রা, হাঁস প্রভৃতি মানত করে ও বলি দেয়।

আটকোণা ও গম্বুজশোভিত মন্দির সারা কোচবিহার জেলায় আর নেই। মন্দিরের প্রস্থচ্ছেদ আটকোণা হওয়ায় এর উপরে কোনও বেঁকি বা গ্রীবা নির্মাণ করার প্রয়োজন হয় নি; একেবারে খিলানযুক্ত দেওয়ালের উপরের লহড়া থেকে বৃত্তের সৃষ্টি করে তার উপরে গম্বুজ স্থাপন করা হয়েছে। গম্বুজের উপরে, প্রথাগতভাবে পর পর পদ্ম, আমলক, কলস ও ত্রিশূল দেখা যায়। স্বর্গত বৎসের মতে, মন্দিরটি ভারতে অনুসৃত ব্রিটিশ স্থাপত্যের (ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী-প্রবর্তিত) নিদর্শন। এর কারণস্বরূপ তিনি মন্দিরের আটকোণা গর্ভগৃহ ও দেওয়ালের গায়ের অট্টালকতুল্য গোল থামের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অনুরূপ ইমারতী নিদর্শন ও গোল থাম ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষের প্রথম দিকের বহু গির্জায় ও প্রাসাদে দেখা যায়। এর অনুকরণে বীরভূমে বা অন্যত্র কিছু কিছু মন্দিরও নির্মিত হয়েছিল। মুসলিম-স্থাপত্য ও ব্রিটিশ-স্থাপত্যের সমন্বয়ে গঠিত এরকম স্থাপত্য-শৈলী কিন্তু বিশেষ প্রসার লাভ করে নি। স্বর্গত বৎসের মতে, মন্দিরটি অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে বা উনবিংশ শতকের প্রথমভাগে নির্মিত। হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর মতেও মন্দিরটি মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের সময়ে তৈরী হয়েছিল (হরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকাল বৎস-নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই প্রায় পড়ে)। অনেকে মন্দিরটিকে যে মহারাজ প্রাণনারায়ণের তৈরী বলে মনে করেন, তা ঠিক নয়।

এ মন্দিরের গর্ভগৃহের এক কোণ থেকে অন্য কোণের দূরত্ব প্রায় ৮ ফুটের (২$\frac{1}{2}$ মিটার) মত হবে। প্রত্যেকটি কোণে আবার নকল দরজায় পাশে দুটি করে ছোট গোল থাম এবং দরজার উপরে অর্ধ-বৃত্তাকার খিলান আছে। খিলানের উপরে চুনবালির তৈরী নানাবিধ পত্র ও জ্যামিতিক অলংকরণ দেখা যায়। প্রবেশদ্বারের পাশেও

এই রকম দুটি বড় ও দুটি ছোট গোল থাম আছে। মন্দিরটির বর্তমান অবস্থা ভাল নয়।

এই দেবালয়ের দক্ষিণে এক প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে একটি কামরাঙ্গা গাছ ও তার মূলে বেদী দেখা যায়। স্থানীয় লোকেরা গাছটিকে কামাখ্যা দেবীজ্ঞানে পূজা করেন ও স্থানটিকে পীঠস্থান বলে মনে করেন। বৃক্ষপূজা লৌকিক পূজা বিশেষ ও কোচবিহারে বেশ জনপ্রিয়।

হরিপুর (কোচবিহার থানা): মধুপুরধামের ১ মাইল (১.৬ কিলোমিটার) পশ্চিমে, তোর্সানদীতীরে, হরিপুর গ্রামে, হরিহর মহাদেবের পশ্চিমমুখী ইটের মন্দিরটি অবস্থিত। মন্দিরটির শিখর চারচালা ও গর্ভগৃহের প্রস্থচ্ছেদ চারকোণা। ভূমিকম্পের ফলে দেবালয়টি বসে গেছে। এখন এর উচ্চতা ১৫ ফুটের (৪.৬ মিটার) মত এবং সাবেক উচ্চতা হয় ত ২৫ ফুটের (৭.৮ মিটার) মত ছিল। ভূমিসংলগ্ন বাহিরের দেওয়ালের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ ১৬′ ৫″ × ১৬′ ৫″ (৫ মিটার × ৫ মিটার) এবং মন্দির-দেওয়াল ৩′ ১০½″ (১.২ মিটার) পুরু। মন্দিরের নীচু গর্ভগৃহকে বৃষ্টির জল ও রোদ থেকে বাঁচাবার জন্য প্রবেশ-দ্বারের সামনে এক দোচালা টিনের আচ্ছাদন নির্মাণ করা হয়েছে। প্রবেশদ্বার থেকে গর্ভগৃহের মেঝের উপরে স্থাপিত শিবলিঙ্গের কাছে পৌঁছুতে হলে আটটি সিঁড়ি ভেঙ্গে প্রায় ৮ ফুট (২.৫ মিটার) নীচে নামতে হয়। প্রথম চারটি সিঁড়ির পর একটু চাতাল আছে। সেখানে কয়েকটি শিবলিঙ্গ রাখা হয়েছে। প্রবেশদ্বারের উপরে একটি খিলান আছে। খিলানের দুই পাশ ও উপর বেলেপাথর দিয়ে বাঁধানো; তার গায়ে লতাপাতার অলংকরণ দেখা যায়। স্বর্গত বৎসের মতে, মন্দিরটি খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগে মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণকর্তৃক স্থাপিত হয়। হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর ধারণা, এটি অষ্টাদশ শতকের তৃতীয় পাদে মহারাজ ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণের সময়ে নির্মিত। কিন্তু পাথরের গায়ের অলংকরণগুলি নিঃসন্দেহে বহু পূর্বের হওয়াই সম্ভব—পাল-যুগের না হলেও মধ্যযুগের তো বটেই। সম্ভবত কামতাপুর দুর্গের ধ্বংসাবশেষ থেকে এগুলি এখানে আনা হয়েছিল। এছাড়া মন্দিরের প্রবেশদ্বারের ও ভোগঘরের সামনে কয়েকটি বেলেপাথর ও কষ্টিপাথরের খণ্ড দেখা যায়—সেগুলি হয়ত অন্য স্থানের অজ্ঞাত কোনও পাথরের মন্দির থেকে আনীত হতে পারে। পূর্বে এখানে কোনও পাথরের মন্দির ছিল বলে মনে হয় না। মন্দিরের পূর্ব দিকের দেওয়ালে,

কার্নিসের নীচে, আলো প্রবেশের জন্য একটি তিনকোণা কুলুঙ্গি আছে। মন্দিরের বাইরে দেওয়ালে অট্টালকের মত চারকোণাকৃতি থাম আছে। দেবতার নিত্যপূজা হয়। মন্দিরটির বর্তমান অবস্থা বিশেষ ভাল নয়।

হলদিবাড়ি (হলদিবাড়ি থানা) ঃ জলপাইগুড়ি শহর থেকে প্রায় ১৮ মাইল (২৯ কিলোমিটার) দক্ষিণে হলদিবাড়িতে পীর একরাস্থল হকের মাজার শরীফটি অবস্থিত। জনশ্রুতি, পীর একরাস্থল হক শাহ সফি খোন্দকার নামে একজন বিখ্যাত মুসলমান ফকির অষ্টাদশ শতকের প্রথম বা মধ্যভাগে হলদিবাড়িতে এসে ইসলামধর্ম প্রচারের জন্য সেখানে এক আস্তানা স্থাপন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভক্তগণ তাঁকে এখানেই কবরস্থ করেন। পরে তাঁর কবরের উপর বর্তমান মাজারটি নির্মিত হয় ও এই স্থান সারা উত্তর বঙ্গের প্রসিদ্ধতম মুসলমান তীর্থস্থানে পরিণত হয়। প্রতি বছর ফাল্গুন মাসে পীর সাহেবের 'উরস' উপলক্ষে এখানে প্রচুর জনসমাগম হয় ও একটি মেলা বসে। হলদিবাড়ি গ্রামে একটি মসজিদ ও দু'একটি ছোট মন্দির আছে যেগুলি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

পরিশিষ্ট

'নারায়ণী মুদ্রা'

ভারতভুক্তির পূর্বে কোচবিহার রাজ্যে প্রচলিত মুদ্রাকে সাধারণভাবে 'নারায়ণী মুদ্রা' বলা হত। এ রাজ্যের সব নৃপতির নামের শেষে 'নারায়ণ' কথাটি থাকার জন্য তাঁদের বংশ 'নারায়ণী বংশ' ও টাকা বা মুদ্রা 'নারায়ণী মুদ্রা' নামে পরিচিত হয়। এহেন নামকরণের আর একটি কারণ, দেবী কামতেশ্বরী ছাড়াও নারায়ণ এ রাজবংশের কুলদেবতা। 'আলমগীরনামা' ও 'রিয়াজ-উস্-সালাতীন'-এ এই টাকার উল্লেখ আছে। এজাতীয় মুদ্রার আর এক নাম ছিল—'শিবটঙ্ক' বা 'শিবাঙ্কটঙ্ক'; কেন না, এই টাকার কোন কোনটির গায়ে শিবের বা শিব-দুর্গার মূর্তি অথবা নাম খোদিত থাকত।

কোচবিহারের প্রথম রাজা বিশ্বসিংহ কোনরূপ টাকার মুদ্রণ করিয়েছিলেন কিনা তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে কোন কোন কুলজী অনুসারে রাজা বিশ্বসিংহ ১৩ 'রাজশকা'য় সিংহাসন লাভ করে নিজের নামে 'সিক্কা' মুদ্রণ করিয়েছিলেন। 'রাজশকা' ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আরম্ভ হয় এবং সে বছরেই বিশ্বসিংহ কোচবিহারের রাজা হন। তাঁর ছেলে নরনারায়ণের সময় থেকে কোচরাজারা নিয়মিতভাবে যে টাকা তৈরী করিয়েছেন, তা রূপার ও মুসলমান সুলতানদের 'তনখা' (টঙ্ক) প্রস্তুতের রীতিতে; তার ওজন প্রায় ১৬৫ গ্রেণ ও গোলাকার হত। উপমাস্বরূপ, সুলতান হোসেন শা'র 'তনখা'র উল্লেখ করা যেতে পারে। কোচবিহারের টাকায় মুসলমানী 'তনখা'র যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়—এমন কি কয়েকটি বিশেষ চিহ্নেও ('মনোগ্রাম' ও 'ক্লিঙ্কফয়েল') তা সুপরিস্ফুট। রাজাদের নামের 'নারায়ণ' শব্দের 'ন' অক্ষরের নীচেও এইরূপ চিহ্ন দেখা যায়। রাজা প্রাণনারায়ণের ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দের একটি টাকায় 'বিন্দু' (·) চিহ্ন আছে। এছাড়া কোন কোন মুদ্রায় 'ঢেঁরা' (×) ও 'অর্ধচন্দ্র' (৺) চিহ্নও বর্তমান। ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ ও হরেন্দ্রনারায়ণ ছাড়া অন্য কোন রাজার টাকায় এরকম চিহ্ন দেখা যায় না। কোচরাজাদের আগে কোচবিহারে বা পুরানো কামতা রাজ্যে খেন রাজারা রাজত্ব করতেন। সে বংশের শেষ রাজা নীলাম্বরকে হারিয়ে হোসেন শাহ কামতারাজ্য অধিকার

করেন। খেন রাজাদের কোন মুদ্রা এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। ত তাঁদেরও মুদ্রা ছিল বলে মনে হয়। রাজপাটের কাছে টাঁকশাল নাম স্থানে যেসব পাথরখণ্ড পড়ে থাকতে দেখা যায়, সেগুলি খেন রাজাদে তৈরী মুদ্রা বলে অনেকে মনে করেন।

কোচবিহারের টাকায় কোন মূর্তি মুদ্রিত নেই। এদের সোজা দিকে ও উল্টো দিকে শুধু সংস্কৃত ভাষায় ও বাংলা অক্ষরে 'লেখন' (legend) থাকে; সোজা দিকে রাজার উপাধি ও উলটো দিকে রাজার নাম ও তারিখ মুদ্রিত দেখা যায়। এই রীতি নরনারায়ণের ছেলে লক্ষ্মীনারায়ণের রাজত্বের কিছু সময় অবধি প্রচলিত ছিল। পরে, কোচবিহারের পশ্চিম ভাগ মুঘলের অধিকারে এলে, কোচরাজারা পুরো টাকা তৈরীর অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে শুধু আধুলি তৈরীর অনুমতি পান।

নরনারায়ণের টাকার 'লেখন' বাংলা অক্ষরে হলেও আকার-প্রকারে তা 'তনখা'রই অনুরূপ। তার সোজা দিকে, 'শ্রীশ্রীশিবচরণকমলমধুকরস্য' ও উলটো দিকে 'শ্রীশ্রীমন্নরনায়ণস্য' বা 'নারায়ণভূপালস্য শাকে ১৪৭৭' এই লিপি উৎকীর্ণ দেখা যায়। লক্ষ্মীনারায়ণের টাকার সোজা দিকে নরনারায়ণের সোজা দিকের মতই 'লেখন' আছে, আর উলটো দিকে আছে 'শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণস্য শাকে ১৫০৯' (বা 'শাকে ১৫৪৯')। লক্ষ্মীনারায়ণের নাতি প্রাণনারায়ণের টাকা ও আধুলিও পাওয়া গেছে। সেগুলির সোজা দিকে পূর্ববৎ 'লেখন' ও উলটো দিকে 'শ্রীশ্রীমৎ প্রাণনারায়ণস্য শাকে ১৫৫৪' (বা ১৫৫৫ বা ১৫৫৯) লিপি দেখা যায়। এঁর একটি টাকায় 'শাকে ১৪০' অর্থাৎ 'রাজশকা ১৪০' মুদ্রিত আছে। প্রাণনারায়ণের ছেলে মোদনারায়ণের একটি আধুলি পাওয়া গেছে যাতে 'রাজশকা ১৭৯' (?) মুদ্রিত আছে। খ্রীষ্টীয় আঠারো শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত মহীন্দ্রনারায়ণ ছাড়া অন্য সব রাজারই তারিখহীন ও আংশিক 'লেখন'যুক্ত আধুলি পাওয়া গেছে। নরনারায়ণের ভাইপো রঘুদেবনারায়ণ ও তাঁর ছেলে পরীক্ষিৎনারায়ণের টাকা নরনারায়ণের টাকার নকলে তৈরী ও তাতে হরগৌরীর নাম দেখা যায়। এ পর্যন্ত কোচবিহারে যেসব টাকা পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে নরনারায়ণের টাকাই সবচেয়ে পুরানো। এ পর্যন্ত তাঁর মোট পাঁচটি টাকা পাওয়া গিয়েছে (ওজন—১৫৭·৫ গ্রেণ থেকে ১৫৮·৪ গ্রেণ)। লক্ষ্মীনারায়ণের মোট আঠারোটি টাকা ও সাতটি আধুলি পাওয়া গিয়েছে (ওজন : টাকা—১৪৭·৯ গ্রেণ থেকে ১৫৫·৪ গ্রেণ ; আধুলি—৭২·৯ গ্রেণ থেকে ৮৫·৯ গ্রেণ)। এগুলির বেশীর ভাগই

১৫০৯ শাকে (একটিতে 'রাজশকা ৯২' লেখা আছে) তৈরী হয়। লক্ষ্মীনারায়ণের ছেলে বীরনারায়ণের টাকা এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি (বীরনারায়ণের টাকা নিয়ে অবশ্য মতের পার্থক্য আছে)। লক্ষ্মীনারায়ণের নাতি প্রাণনারায়ণের নয়টি টাকা ও নয়টি আধুলি পাওয়া গিয়েছে (ওজন : টাকা—১৪২ গ্রেণ থেকে ১৫৩·৩ গ্রেণ ; আধুলি—৬১·৩ গ্রেণ থেকে ৭৮·৭ গ্রেণ)। এই রাজার টাকায় 'শাক' শব্দের উল্লেখ আছে, যা শকাব্দ ও 'রাজশক' উভয়কেই বোঝাতে পারে। এই নৃপতির টাকায় চারটি তারিখ দেখা যায়—শাকে ১৪০, শাকে ১৫৫৪, শাকে ১৫৫৫ ও শাকে ১৫৫৯। প্রাণনারায়ণের ছেলে মোদনারায়ণের সময় থেকেই কোচবিহারে রাজমুদ্রা তৈরী করা একরকম বন্ধ হয়ে যায়। তাঁর সময়ে তৈরী মাত্র একটি আধুলি পাওয়া গিয়েছে (ওজন —৭৫·২৮ গ্রেণ)। মোদনারায়ণের পরবর্তী রাজাদের আধুলি ছাড়া অন্য কোন রকম মুদ্রা পাওয়া যায় নি। সেসব আধুলির ওজন ৬২ গ্রেণের কম নয়, আবার ৭০ গ্রেণের বেশী নয়। শিবেন্দ্রনারায়ণের সময় থেকে টাকায় পুরানো বাংলা বা মৈথিলী বড় হরফের বদলে বর্তমান বাংলা ছোট হরফের ব্যবহার আরম্ভ হয়। এই নৃপতির সোনার ষোলটি ও রূপার আটটি টাকা আবিষ্কৃত হয়েছে। সোনার টাকাকে 'অর্ধমোহর' ও রূপার টাকাকে 'আধুলি' বলে। নরেন্দ্রনারায়ণ ও নৃপেন্দ্রনারায়ণের যথাক্রমে, বারোটি অর্ধমোহর ও পাঁচটি আধুলি ও ছ'টি অর্ধমোহর ও এগারো শ'টি আধুলি পাওয়া গিয়েছে। রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ, জিতেন্দ্রনারায়ণ ও জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণের সোনার ও রূপার টাকা এখনও নানা জায়গায় দেখা যায়। রাজরাজেন্দ্রনারায়ণের টাকা পূর্ববর্তী রাজাদের থেকে একেবারে অন্য ধরনের—এতে চিরাচরিত 'শিবচরণকমলমধুকরস্য'-র বদলে 'যতোধর্মস্ততোজয়' ও 'রাজচিহ্ন' বা coat of arms (সিংহ ও হাতির মূর্তি) মুদ্রিত আছে। পরবর্তী নৃপতিদের টাকায় সিংহের জায়গায় বাঘের মূর্তি স্থান পায়। নৃপেন্দ্র-নারায়ণ, রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ, জিতেন্দ্রনারায়ণ ও জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণের টাকাগুলি যথাক্রমে, সন ৩৫৪ শকা, রাজশকা ৪০২, রাজশকা ৪০৪ ও রাজশকা ৪১৩-তে তৈরী। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের পরে যেসব টাকা তৈরী হয়েছে (অর্থাৎ নৃপেন্দ্রনারায়ণের সময় থেকে) সেগুলি ঠিক নিয়মিত-ভাবে প্রস্তুত হয় নি—সেগুলি মুদ্রিত হয়েছে রাজাদের অভিষেককে স্মরণীয় করে রাখার প্রয়োজনে। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে 'নারায়ণী মুদ্রা'কে ছ'ভাগে ভাগ করার প্রয়োজন দেখা দেয়—একটি পুরানো ও অন্যটি

নতুন; নরনারায়ণ থেকে দেবেন্দ্রনারায়ণের সময় অবধি প্রস্তুত মুদ্রাকে 'পুরানো' ও পরবর্তিকালের মুদ্রাকে 'নতুন' বলে গণ্য করা হয়।

পূর্বভারতে ব্রিটিশ শাসন কায়েম হবার পর থেকেই, অর্থাৎ ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নিজেদের ক্ষমতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে, কোচবিহারের রাজাদের স্বাধীনভাবে টাকা তৈরীর অধিকারকে নানাভাবে খর্ব করবার চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু হরেন্দ্রনারায়ণ প্রভৃতি রাজাদের দৃঢ় মনোভাবের জন্য সে চেষ্টা তখনকার মত ব্যাহত হয়। কিন্তু ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের এক আদেশের বলে ব্রিটিশ সরকার এই টাকা তৈরীর অধিকার ও ব্যবহার রহিত করে দেন। ফলে, কোচবিহারে একদিকে যেমন কোচরাজাদের টাকার ব্যবহার বন্ধ হয়ে গেল, অন্যদিকে তেমনি সেখানে বিটিশ সরকারের টাকার প্রচলন হল। সেজন্য রাশি রাশি 'নারায়ণী মুদ্রা' হয় ধ্বংস করা হল নয় তো বিক্রি করে বা বিলিয়ে দেওয়া হল। অতএব, পরবর্তিকালে 'নারায়ণী মুদ্রা' পরিণত হল এক বিরল বস্তুতে। অবশ্য কিছু কিছু স্বদেশী ও বিদেশী মিউজিয়মে এই টাকা এখনও রক্ষিত আছে। এদেশীয় মিউজিয়মগুলির মধ্যে—কলিকাতার ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম, আশুতোষ মিউজিয়ম, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মিউজিয়ম, এসিয়াটিক সোসাইটি মিউজিয়ম, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরাতাত্ত্বিক গ্যালারি ও গৌহাটিতে অবস্থিত আসাম সরকারের মিউজিয়মের নাম করা যেতে পারে। বিদেশী মিউজিয়মগুলির মধ্যে ব্রিটিশ মিউজিয়মের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, আসামের সরকারী তোশাখানায়, কোচবিহার জেলার সরকারী সদর তোশাখানায়, কোচবিহার রাজবাড়ি ও কোচবিহার সাহিত্যসভায় এই টাকা কিছু কিছু সঞ্চিত আছে।

'নারায়ণীর মুদ্রা' কিভাবে, কোথায় তৈরী হত তার কোনও সঠিক হদিশ পাওয়া যায় না; তবে, কোচবিহার শহরের কাছে টাকাগাছ গ্রামের টাঁকশাল থেকে বছরে যে প্রায় পঞ্চাশ হাজার 'নারায়ণী মুদ্রা' প্রস্তুত হত এমন মনে করবার কারণ আছে। এই টাঁকশালে টাকা মুদ্রণের কাজ দেখাশোনার জন্য একজন মোটা মাহিনার রাজকর্মচারী নিযুক্ত ছিলেন। তাঁকে 'ভাণ্ডারঠাকুর' বলা হত। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দেও এই টাঁকশাল থেকে প্রায় ত্রিশ হাজার আধুলি তৈরী হয়েছিল। সে সময়ে একটি রূপার আধুলিতে প্রায় $\frac{1}{8}$ ভাগ তামা মেশানো হত এবং ১০০টি 'সিক্কা'র বদলে ১১৫-১১৯টি 'নারায়ণী' টাকা পাওয়া যেত।

নরনারায়ণের সময় থেকেই 'নারায়ণী মুদ্রা' জনপ্রিয় হয়ে ওঠে ও তার চাহিদা ক্রমে ক্রমে পূর্ব ভারতে প্রায় সব ক'টি রাজ্যেই ছড়িয়ে পড়ে। জয়ন্তিয়া, কাছাড়, ডিমরুয়া প্রভৃতি রাজ্যের রাজারা এই টাকার নকলে টাকা তৈরী করতে থাকেন। ভুটান ও আসামের লোকেদের কাছে এই টাকার কদর এত বেড়ে যায় যে, ওই দুই রাজ্যের অনেক অসাধু লোক পাইকারী হারে জাল 'নারায়ণী মুদ্রা' তৈরী করে বিভিন্ন রাজ্যে সেগুলি গোপনে চালান দিতে থাকে।

কোচবিহারে কোম্পানীর শাসন কায়েম হবার পরেও লোকেদের কোম্পানীর টাকার চেয়ে কোচরাজাদের 'নারায়ণী' টাকার উপর বেশী আস্থা ও আগ্রহ ছিল। 'নারায়ণী মুদ্রা'কে কোচবিহারের অধিবাসীরা লক্ষ্মীজ্ঞানে ভক্তি বা পূজাও করতেন এবং শিশুদের অপদেবতা প্রভৃতির কুদৃষ্টি থেকে রক্ষা করবার জন্য এই মুদ্রা মাদুলি বা তাবিজের আকারে ব্যবহৃতও হত।

গ্রন্থপঞ্জী

আহমেদ, আমানত উল্লা —কোচবিহারের ইতিহাস (১ম খণ্ড) : কোচবিহার, ১৯৩৬।

গ্যেট, ই. এ. —হিষ্ট্রি অফ আসাম (২য় মুদ্রণ) : কলিকাতা, ১৯২৬।

—কোচ কিংস অফ কামরূপ (প্রবন্ধ) : জার্নাল অফ দি রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, খণ্ড ৬২, ১ম ভাগ।

ঘোষাল, এস. সি. —হিষ্ট্রি অফ কুচবিহার : কুচবিহার, ১৯৪২।

চক্রবর্তী, যাদবচন্দ্র —কোচবিহার রাজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : কোচবিহার, ১৮৮৩।

চক্রবর্ত্তী, রজনীকান্ত —গৌড়ের ইতিহাস (২য় খণ্ড) : কলিকাতা, ১৯০৯।

চাটার্জী, সুনীতিকুমার —কিরাত-জন-কৃতি (ইংরেজী) : কলিকাতা, ১৯৫১।

চৌধুরী, এইচ. এন. —কুচবিহার স্টেট এণ্ড ইটস ল্যাণ্ড রেভিনিউ সেটলমেণ্ট : কুচবিহার, ১৯০৩।

দানী, এ. এইচ. —মুসলিম আর্কিটেক্চার ইন বেঙ্গল : ঢাকা, ১৯৬৪।

দাশগুপ্ত, পরেশচন্দ্র —অরণ্যছায়ার দুর্গে : কলিকাতা, ১৯৭০।

বড়ুয়া, কে. এল. —আর্লি হিষ্ট্রি অফ কামরূপ : শিলং, ১৯৩৩।

বড়ুয়া, বি. কে. —এ কালচারাল হিষ্ট্রি অফ আসাম (১ম খণ্ড) : গৌহাটি, ১৯৫১।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয়কুমার —বাঁকুড়ার মন্দির : কলিকাতা, ১৩৭১ সন।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ভগবতীচরণ —কোচবিহারের ইতিহাস : কোচবিহার, ১৮৮২।

বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালচন্দ্র —বাঙ্গালার ইতিহাস (২য় খণ্ড) : কলিকাতা, ১৯১৭।

বোথাম এণ্ড ফ্রিয়েল —সাপ্লিমেণ্ট টু দি ক্যাটালগ অফ প্রভিন্সিয়াল ক্যাবিনেট কয়েনস অফ আসাম : শিলং।

ব্যানার্জী, অম্রীশ —সাম পোস্ট-মুসলিম টেম্পলস অফ বিহার (প্রবন্ধ) : জার্নাল অফ দি এসিয়াটিক সোসাইটি, ৪র্থ খণ্ড, ১৯৬২।

—টেম্পলস অফ ত্রিপুরা, বারাণসী, ১৯৬৮।

ব্রাউন, পার্সি —ইণ্ডিয়ান আর্কিটেক্‌চার (ইসলামিক পিরিয়ড) : বম্বে, ৩য় মুদ্রণ।

ভট্টাচার্য, জে. এম. —আসাম বুরঞ্জী : গৌহাটি, ১৯৬২।

ভট্টাচার্য, নিবরণচন্দ্র —কোচবিহারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : কোচবিহার, ১৯২২।

মজুমদার, ব্রজচন্দ্র —গোঁসানীমঙ্গল : কোচবিহার, ১৩০৬ সন।

মজুমদার, রমেশচন্দ্র —বাংলা দেশের ইতিহাস—মধ্যযুগ : কলিকাতা, ১৩৭৩ সন।

মার্টিন, এম —ইস্টার্ণ ইণ্ডিয়া (৩য় খণ্ড) : লণ্ডন, ১৮৩৮।

মিত্র, অশোক —পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা (১ম খণ্ড) : দিল্লী, ১৯৬৯।

রায়, বি. —ডিস্ট্রিক্ট সেন্সাস হাণ্ডবুক—ওয়েস্ট বেঙ্গল, কুচবিহার : কলিকাতা, ১৯৬৬।

সরকার, জে. এন. —হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল—মুসলিম পিরিয়ড (২য় খণ্ড) : ঢাকা, ১৯৪৮।

সান্যাল, দুর্গাচরণ —বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস।

স্টেপলটন, এইচ. ই. —ক্যাটালগ অফ দি প্রভিন্সিয়াল ক্যাবিনেট অফ কয়েনস্—ইস্টার্ন বেঙ্গল এণ্ড আসাম : শিলং, ১৯১১।

হাণ্টার, ডব্লু. ডব্লু. —স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউণ্টস্ অফ বেঙ্গল, রংপুর, বগুড়া, কুচবিহার এণ্ড জলপাইগুড়ি : ১০ম খণ্ড।

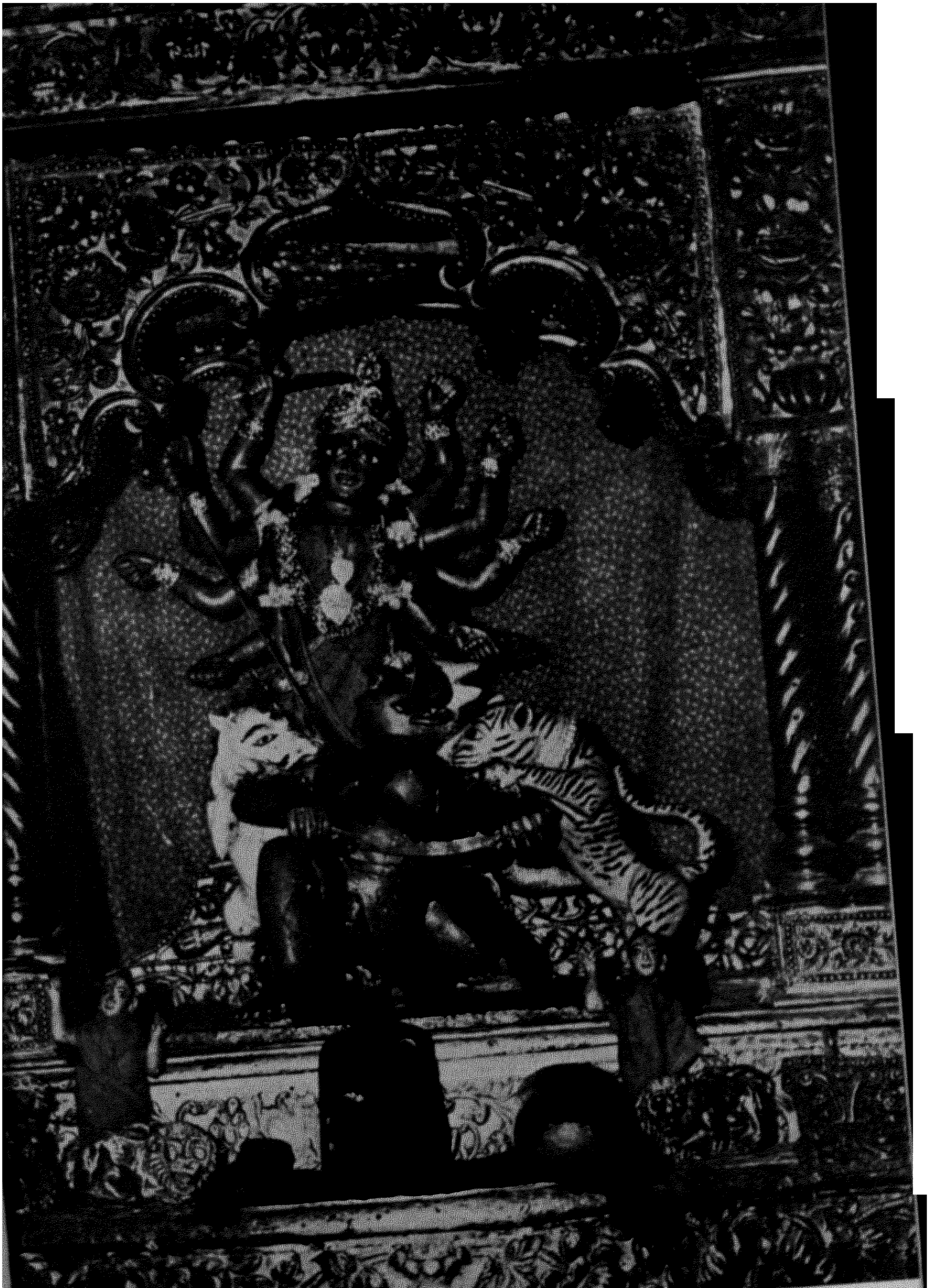
অনুক্রমণিকা*

* স্থানবাচক নামগুলি পৃষ্ঠা উল্লেখ করে সূচীপত্রে দেখানো হয়েছে ব'লে অনুক্রমণিকার অন্তর্ভুক্ত হয় নি।

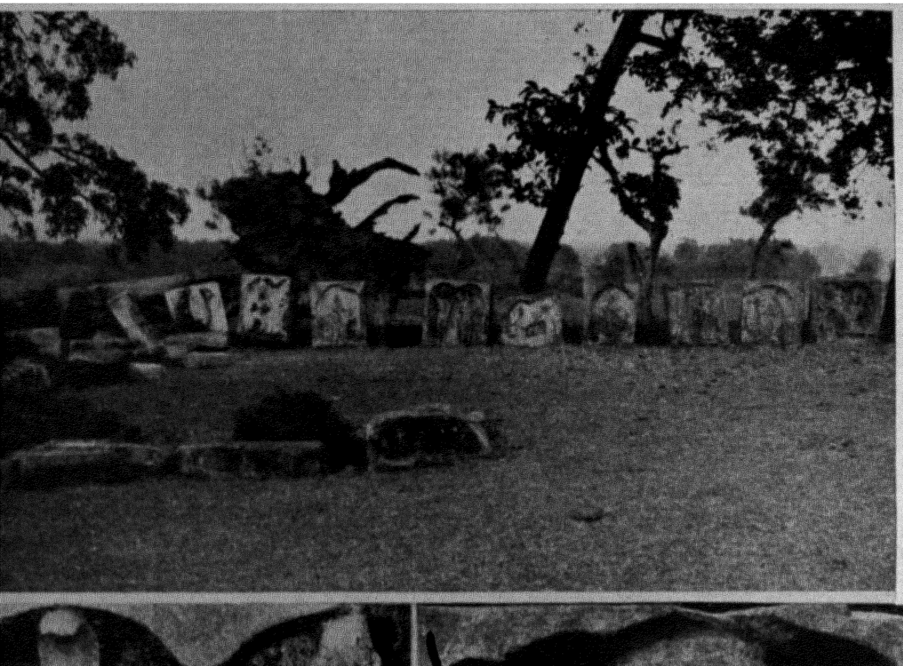
ভ্রম সংশোধন : 'বুরুঞ্জী' স্থানে সর্বত্র 'বুরঞ্জী' হবে

আলোকচিত্র

পরবর্তী আলোকচিত্রগুলি পশ্চিমবঙ্গ পুরাতত্ত্ব অধিকারের আলোকচিত্রশিল্পী শ্রীরণজিৎকুমার সেন কর্তৃক গৃহীত এবং সেগুলির সর্বস্বত্ব ওই অধিকারকর্তৃক সংরক্ষিত।

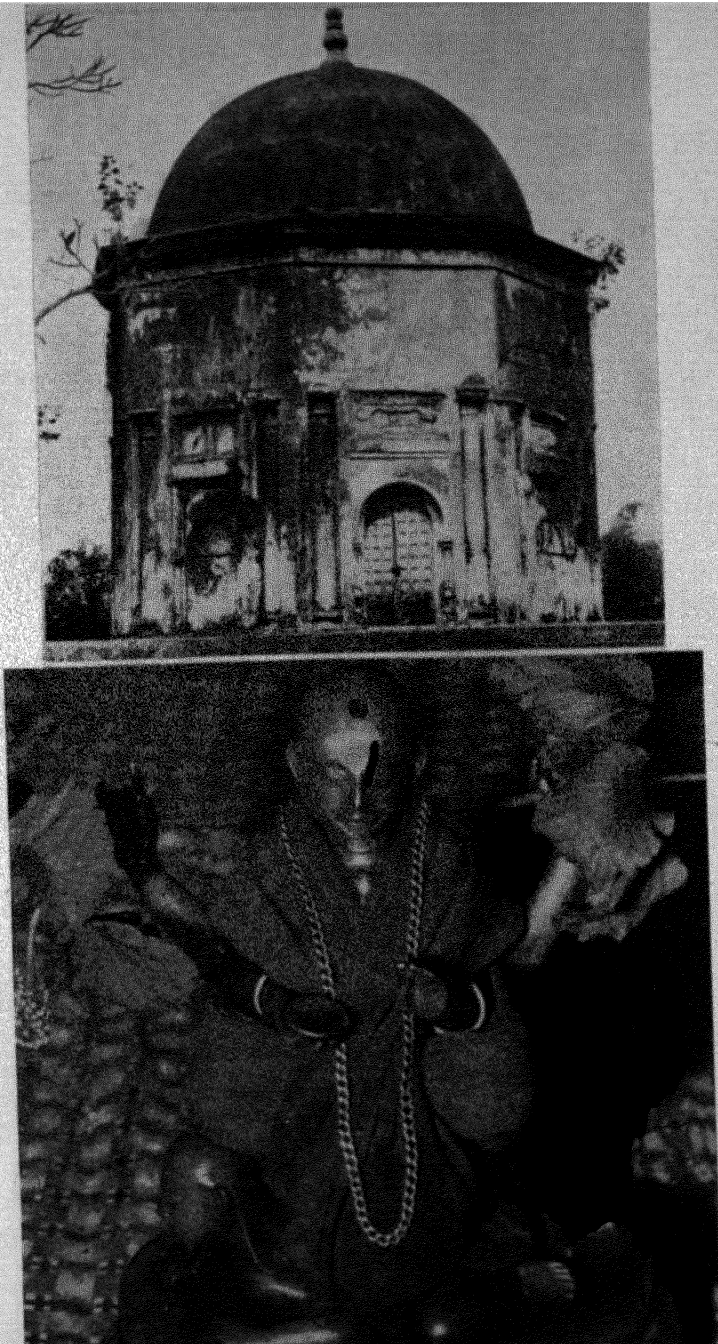


মদনমোহন মন্দিরপ্রাঙ্গণে ভবানীমূর্তি : কোচবিহার শহর





রাজপাট ঢিবির উপর অলংকৃত প্রস্তরখণ্ড ও
(নীচে) কৃষ্ণ-নাগিনী এবং 'ভারলীলা' (পৃঃ ৩৪-৭)

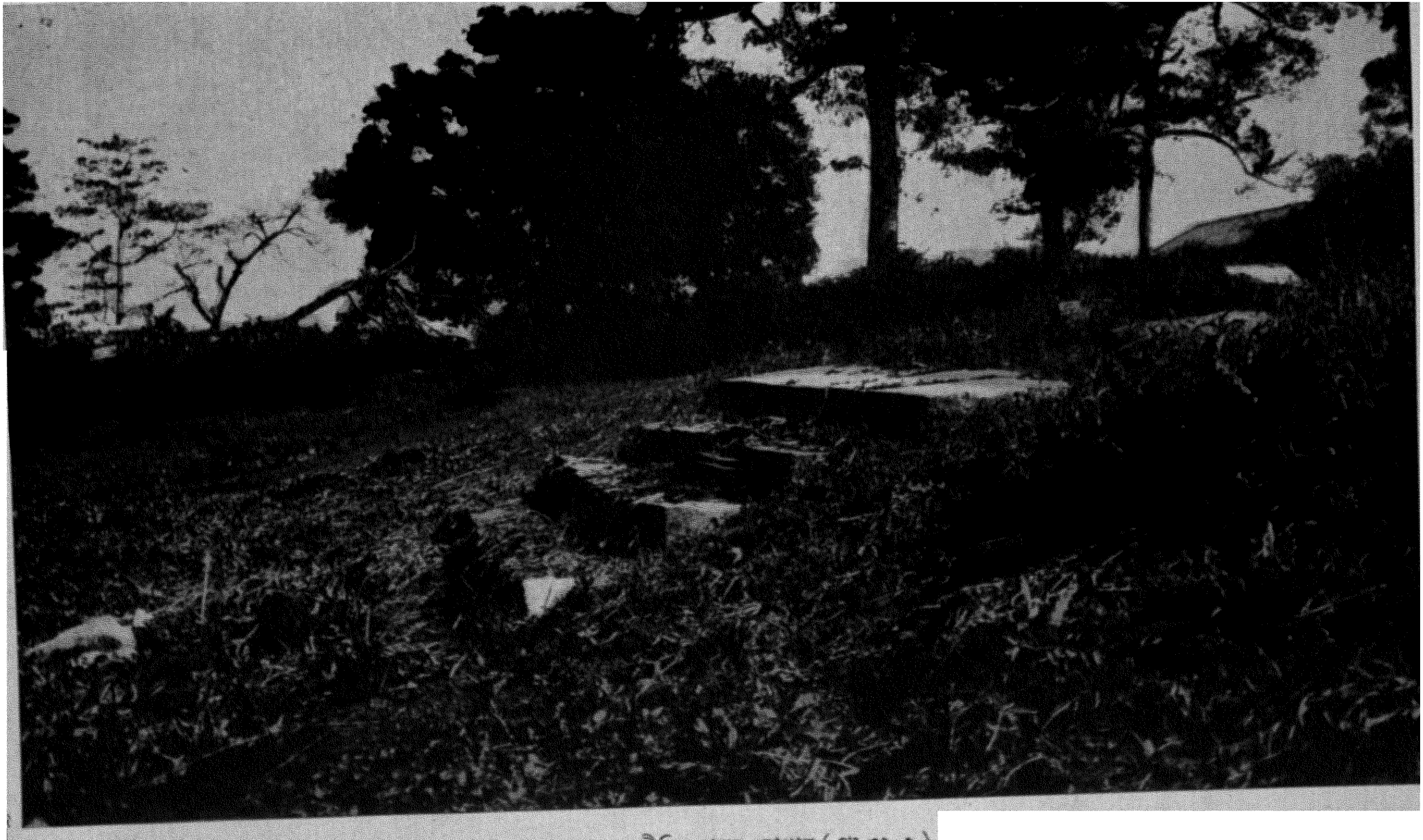


সিদ্ধেশ্বরী মন্দির ও মূর্তি : সিদ্ধেশ্বরী (পৃঃ ৫৯-৬১)

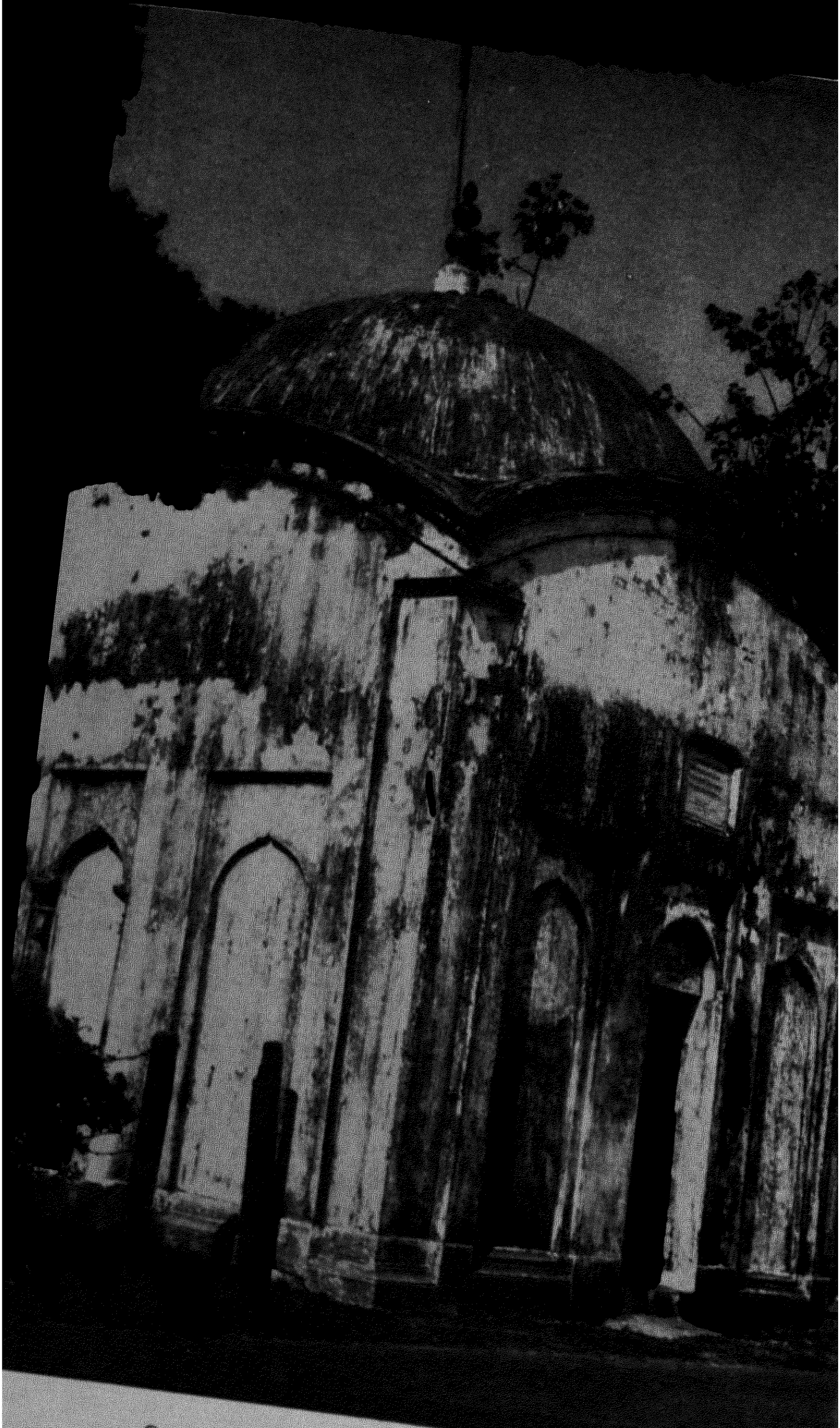




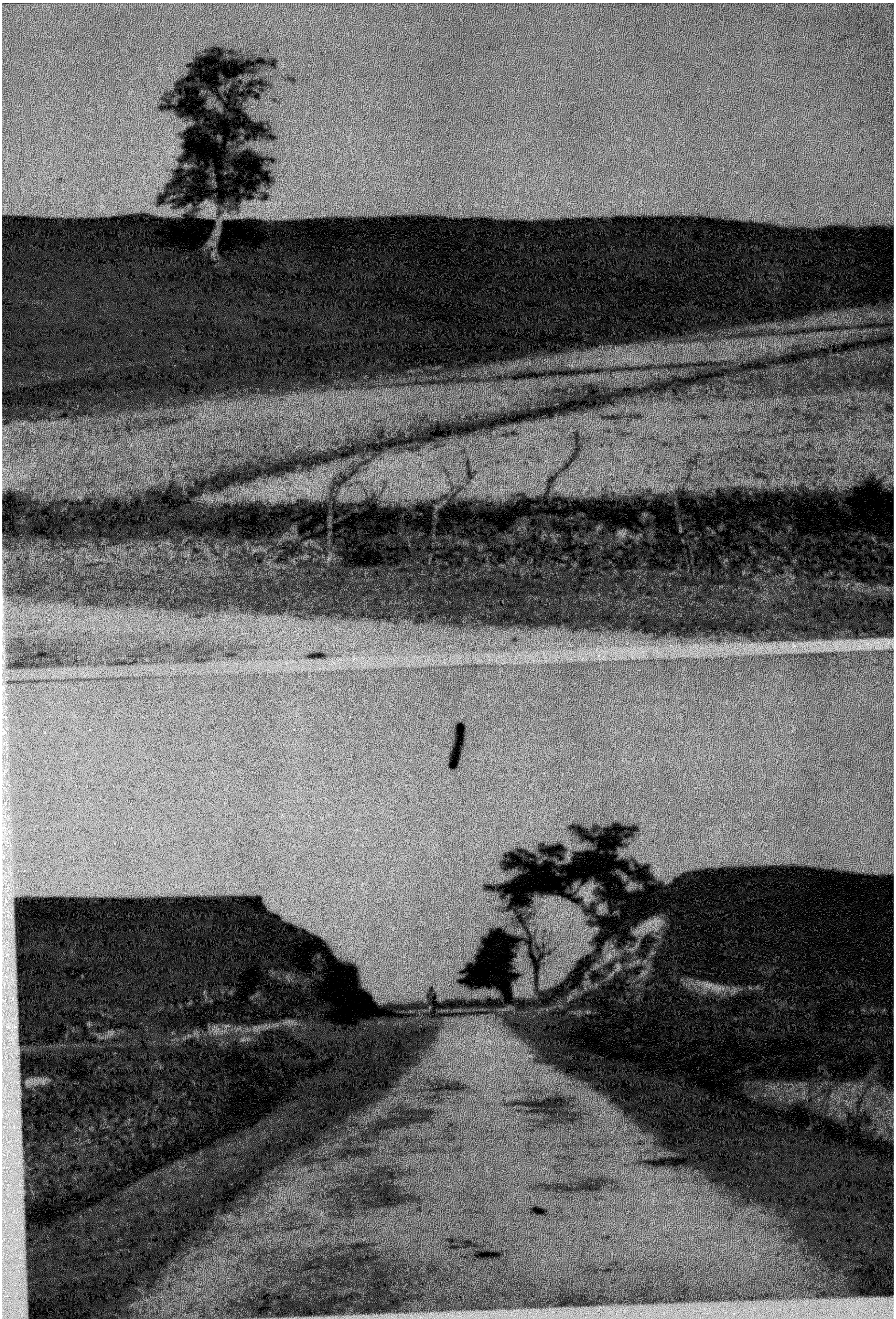
শিবের ধ্যানমূর্তি (বা বুদ্ধমূর্তি) ও অর্ধনারীশ্বর মূর্তি ঃ বাণেশ্বর (পৃঃ ৫২-৬)



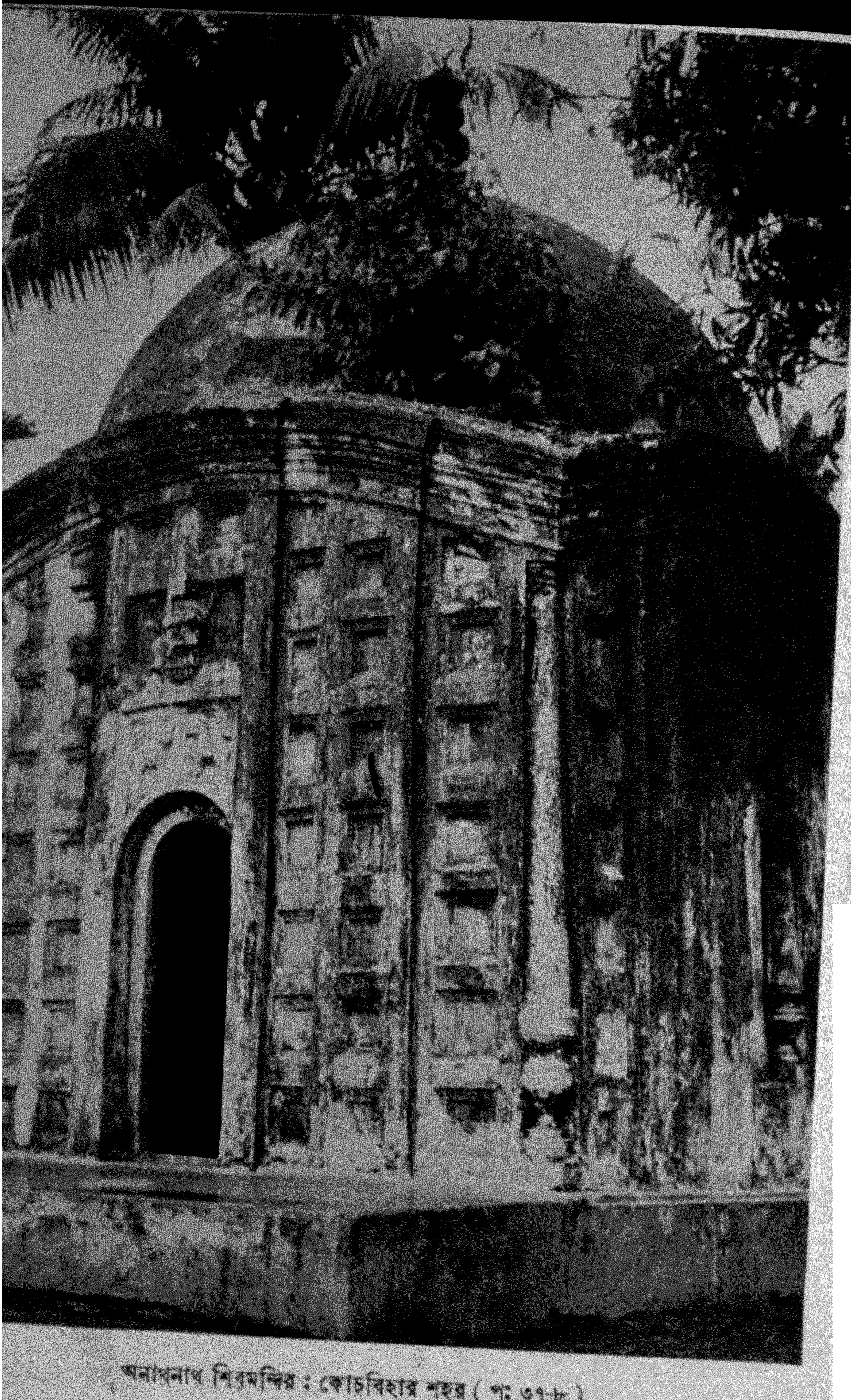
ভোলানাথের দীঘির প্রস্তর-সোপান (পৃঃ ৩২-৩)



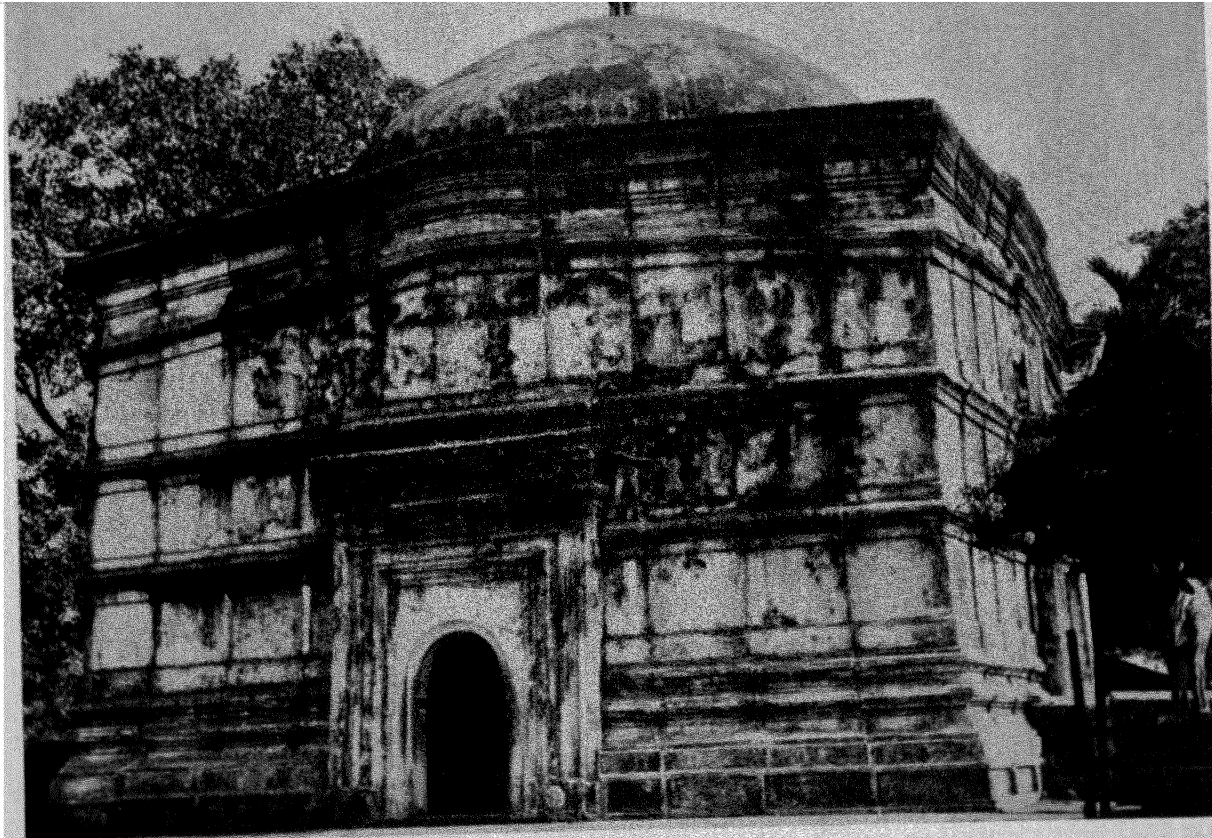
হিরণ্যগর্ভ শিবমন্দির :



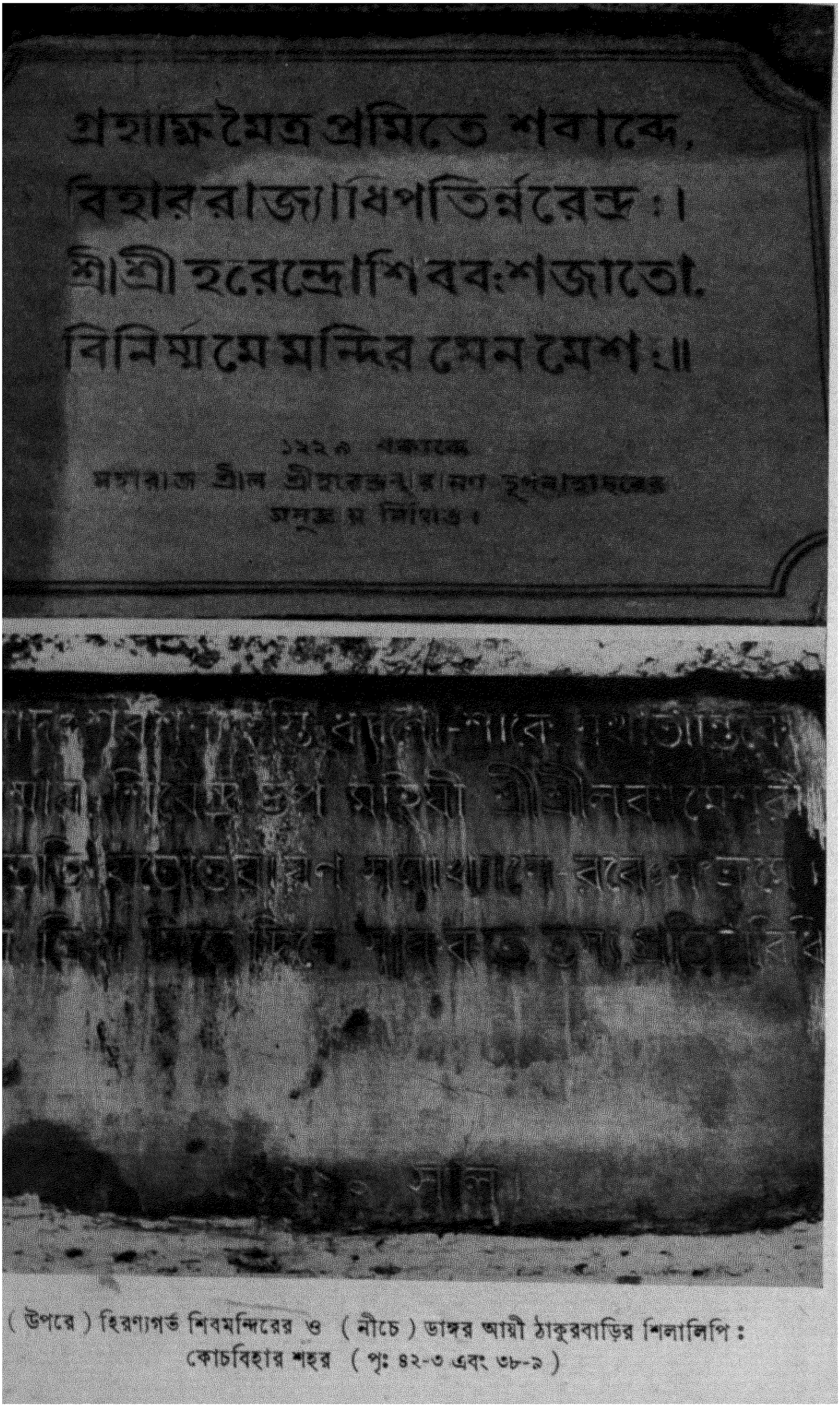
কামতাপুর দুর্গের মাটির প্রাকার ও 'বাঘদুয়ার' প্রবেশপথ (পৃঃ ৩০-৭)



অনাথনাথ শিবমন্দির : কোচবিহার শহর (পৃঃ ৩৭-৮)



বাণেশ্বর শিবমন্দির : বাণেশ্বর (পৃঃ ৫২-৬)



(উপরে) হিরণ্যগর্ভ শিবমন্দিরের ও (নীচে) ডাঙ্গর আয়ী ঠাকুরবাড়ির শিলালিপি :
কোচবিহার শহর (পৃঃ ৪২-৩ এবং ৩৮-৯)





(উপরে) ডাঙর আয়ী ঠাকুরবাড়ি ও গুঞ্জাবাড়ি : কোচবিহার শহর (পৃঃ ৩৮-৯)
(নীচে) পুরানী মসজিদ : কোচবিহার শহর (পৃঃ ৪৩-৪)



পশ্চিমবঙ্গ পুরাতাত্ত্বিক গ্যালারীতে রক্ষিত শীতলকুচিতে প্রাপ্ত কষ্টিপাথরের সূর্যমূর্তি : আনুমানিক খ্রীঃ দ্বাদশ শতক

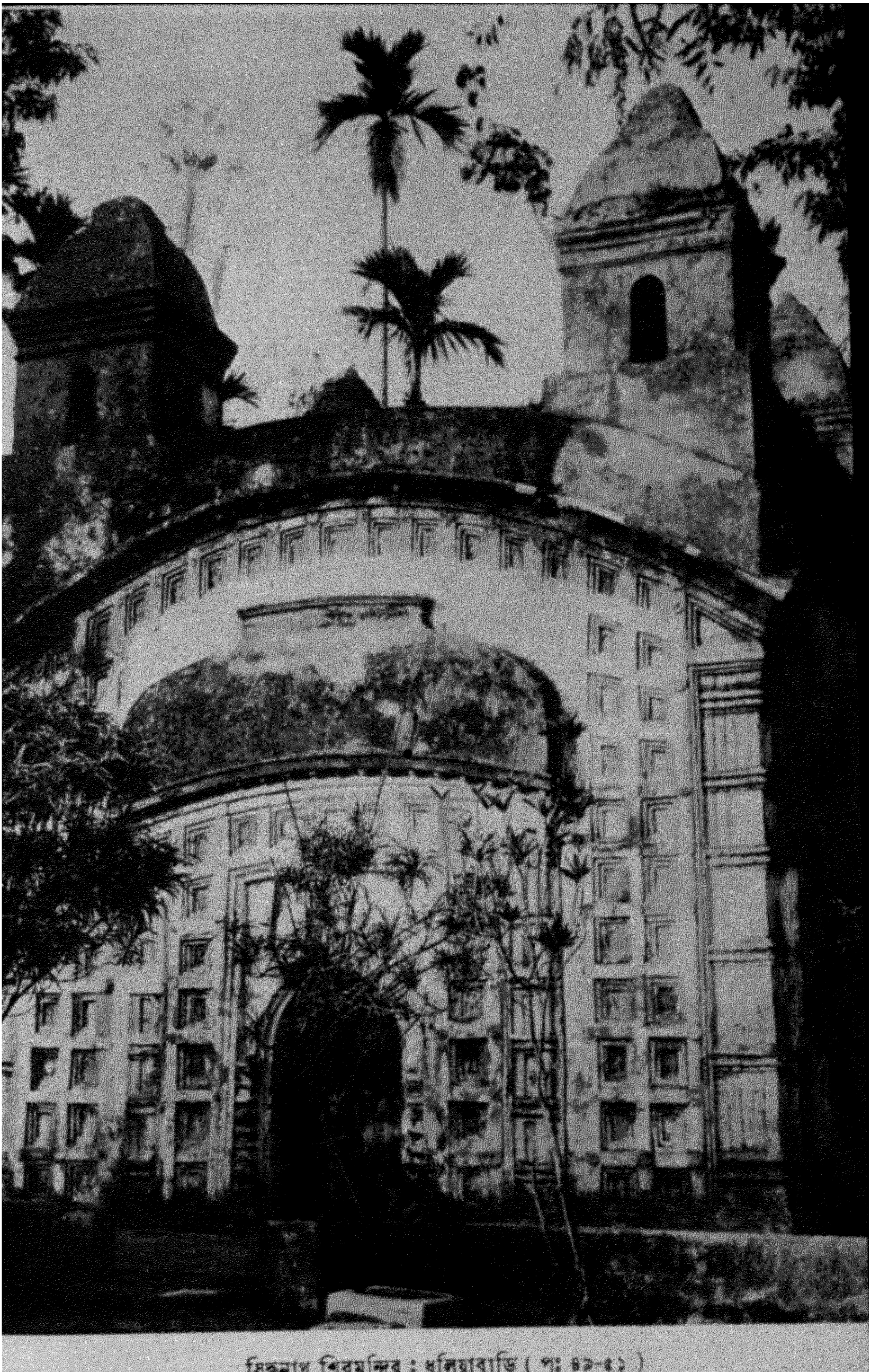




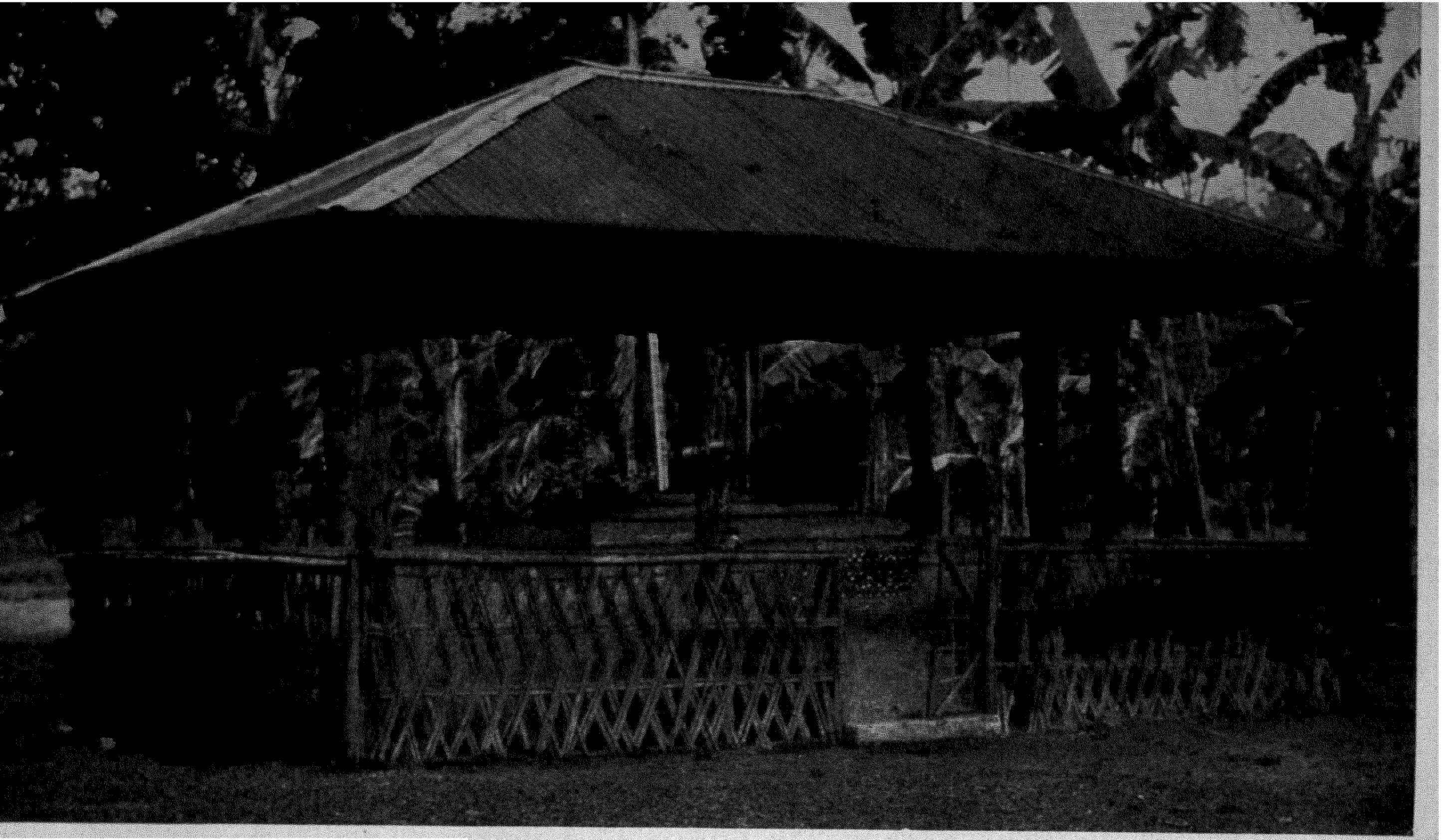
(উপরে) কামতেশ্বরী মন্দির : গোঁসানীমারি (পৃঃ ৪৫-৭)
(নীচে) মদনমোহন মন্দির : কোচবিহার শহর (পৃঃ ৪০-১)



শ্রী বা শঙ্করমন্দির : মধুপুরধাম (পৃঃ ৫৮-৯)



সিদ্ধনাথ শিবমন্দির : ধলিয়াবাড়ি (পৃঃ ৪৯-৫১)



তোর্সাপীরধাম : গুদাম মহারাণীগঞ্জ (পৃঃ ৪৪)